'আহলে হাদীসে'র বিভ্রান্তি ও সুন্নাতে নববীর আদর্শ

আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক

গত ২৮ মার্চ ২০১৫ খ্রি. রোজ শনিবার লালবাগ চৌরাস্তার পার্শ্বে আইম্মায়ে মাসাজিদ, উলামায়ে কেরাম ও স্থানীয় জনগণের যৌথ উদ্যোগে এক বিরাট দীনী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে রাত ১১.০০ হতে ০১.৩০ পর্যন্ত দীর্ঘ ও সারগর্ভ বয়ানে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. বর্তমান লা-মাযহাবীদের সৃষ্ট বিভ্রান্তিসমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করেছিলেন। মূল্যবান বয়ানটি দেশব্যাপী সকল হকপছন্দ্ ও সত্যানুসন্ধানীর হাতে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে রাবেতায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। -সম্পাদক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাধারণত কোন আহলে হাদীস আমার সামনে পড়ে না। অনেক আগে একজন আহলে হাদীসের দেখা পেয়েছিলাম। কথা প্রসঙ্গে তাকে বললাম, হাদীস যে মানতে হবে, কুরআন-হাদীস থেকে আমাকে এর মাত্র একটি দলীল পেশ করুন। পক্ষান্তরে আমাদেরকে সুন্নাত মেনে চলতে হবে এর পক্ষে আমি আপনাকে প্রচুর হাদীস দেখাবো। তিনি আমার কাছ থেকে এক সপ্তাহ সময় নিয়ে সেই যে গেলেন, দীর্ঘ ১৫ বছর হয়ে গেল এখনও তার এক সপ্তাহ শেষ হয়নি। আসলে হাদীস মানতে হবে, এমন বর্ণনা সংবলিত হাদীস তো তার কাছে নেই–ই, সুতরাং সে দেখাবে কোত্থেকে?

আমাদেরকে যেহেতু সুন্নাত মানতে হবে এজন্য আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, আমাদের মাদরাসাসমূহের পঠিত কিতাবগুলোতে শরীয়তের চার দলীলের বিবরণ এভাবে দেয়া হয়– কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস। অর্থাৎ হাদীস না বলে সুন্নাহ বলা হয়। বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাব যারা সংকলন করেছেন তারাও তাদের কিতাবের নাম রেখেছেন সুন্নাত দ্বারা, হাদীস দ্বারা নয়। তাদের রাখা নামগুলো লক্ষ্য করুন। যেমন: সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে বাইহাকী, সুনানে দারেমী ইত্যাদি। উল্লেখ্য, 'সুনান, শব্দটি সুন্নাত-এর বহুবচন। তো হাদীসের কিতাবের নামকরণ করা হয়েছে সুনান দ্বারা; হাদীস দ্বারা নয়। বলুন, যারা এত বড় বড় কিতাব সংকলন করেছেন তারা কি চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হাদীস শব্দ পরিহার করে সুন্নাত শব্দে নিজেদের কিতাবের নাম রেখেছেন? আসলে আমাদেরকে যেহেতু হাদীস মানতে বলা হয়নি; বলা হয়েছে সুন্নাত মানতে, এজন্য তারা তাদের কিতাবের নামকরণ করেছেন সুনান। তাহলে সুন্নাত এবং হাদীসের পার্থক্য আপনাদের বুঝে এসেছে। এখন বলুন, আহলে হাদীস নামটি সঠিক, নাকি আহলুস সুন্নাহ নামটি? যে দলের নামটাই ভুল সে দল কিভাবে সঠিক হয়? তাদের ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য এই এক জবাবই যথেষ্ট, এক দলীলই যথেষ্ট।

ইলমের মারকায ও দারুল উলূম দেওবন্দ

এখন দুনিয়ায় ইলমের প্রাণকেন্দ্র হল ভারতবর্ষ। এর আগে ছিল রাশিয়া, তার আগে ছিল স্পেন, তার আগে ছিল শাম এবং মিশর, তার আগে ছিল কূফা। ... এখন পুরা দুনিয়ার ইলমী কেন্দ্র হল ভারতবর্ষ। এ ভূ-খণ্ডে যত মাদরাসা দেখছেন প্রায় সবগুলোই দেওবন্দ মাদরাসার শাখা-প্রশাখা। ইংরেজরা এদেশ দখল করার পর সমস্ত মাদরাসা বন্ধ করে দিয়েছিল। মোঘল শাসনামলে একেকটা মাদরাসার নামে হাজার হাজার একর জমি ওয়াক্‌ফ ছিল। ইংরেজরা সব বাজেয়াপ্ত করে হিন্দুদেরকে বণ্টন করে দিয়েছিল। ফলে অল্প ক'দিনের মধ্যেই মাদরাসাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। উলামায়ে কেরাম দেখলেন, মাদরাসাগুলো বন্ধ করে দিয়ে ইসলামকে এ দেশ থেকে চিরতরে মিটিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। কাজেই তারা ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে ভারতের উত্তর প্রদেশের থানা শহর দেওবন্দে, একটি ডালিম গাছের নিচে, একজন উস্তাদ আর একজন ছাত্র দিয়ে কওমী মাদরাসা চালু করলেন। উস্তাদের নাম ছিল মোল্লা মাহমূদ, আর ছাত্রের নাম মাহমূদুল হাসান।

তারা আজ থেকে ১২০/১৩০ বছর পূর্বে ডালিম গাছের নিচে মাদরাসাটি চালু করেছিলেন। এখন সেটা কয়েকশ বিঘা প্রশস্ত হয়ে গেছে। আট/দশ হাজার তালেবে ইলম সেখানে পড়ালেখা করছে। বর্তমানে দুনিয়ার যেখানেই সহীহ দীনের সন্ধান পাবেন খোঁজ করলে দেখবেন, তার শেকড় দেওবন্দে গিয়ে মিলেছে।

কুরআনের দাওয়াত পুনরায় সম্পূর্ণ সহীহরূপে চালু হয়েছে কার মাধ্যমে? হযরত ইলিয়াস রহ. এর মাধ্যমে। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে তাফসীরের ছাত্র ছিলেন। বোঝা গেল, যারা তাবলীগ মানে তাদেরকে মাদরাসাও মানতে হবে। যারা তাবলীগ মানে তাদেরকে খানকাও মানতে হবে। কারণ হযরত ইলিয়াস রহ. মুফতী রশীদ আহমদ গঙ্গুহীর খানকায় এক বছর সময় লাগিয়েছিলেন। মুফতী রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. ঐ শতাব্দির বড় আলেম ছিলেন। একবার লোকেরা তার কাছে নালিশ করল, হুযূর! ইলিয়াস তো শুধু ঘুমায়! শোনে হযরত গঙ্গুহী রহ. বললেন, তোমরা বলছো ইলিয়াস শুধু ঘুমায়, না, সে তো আসলে মুরাকাবা (ধ্যান) করে। মনে রেখো, ইলিয়াস একদিন পুরা দুনিয়াবাসীকে জাগিয়ে তুলবে। আজ আরবরা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছে, পুরা দুনিয়ায় ইলম ছড়িয়ে পড়ছে। এখন ইজতিমার ময়দানে হাজার হাজার আরব আসছে। তো আপনি তাবলীগ করছেন, আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি অনেক বড় কাজ করছেন, কিন্তু খবরদার! খানকাকে অস্বীকার করবেন না, মাদরাসাকে অস্বীকার করবেন না।

যা হোক, আলোচনা চলছিল মাযহাব নিয়ে। তো মাযহাব মানার বিষয়টি পুরো দুনিয়াতেই পরিলক্ষিত হয়। আরব ভূখণ্ডে হাম্বলী মাযহাব, এশিয়ায় হানাফী মাযহাব, ইন্দোনেশিয়ায় শাফেয়ী মাযহাব। আহলে হাদীসদের দাবী হল, কুরআন-হাদীস থাকতে মাযহাব মানতে হবে কেন? এটা আসলে বিভ্রান্তিকর একটি কথা। তারা একথা বলে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। তারা বলে, হাদীসের কিতাবগুলো এখন বাংলায় অনূদিত হয়ে গেছে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন তা করে দিয়েছে, তাহলে আবু হানীফাকে মানার আর দরকার কি? তাদের এ ধরনের উক্তি মানুষকে দিন দিন দীন ইসলাম থেকেই দূরে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু কথা হল, মাযহাব ছাড়া কি কুরআন-হাদীস মানা যায়? যায় না। উদাহরণত আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। (সূরা মায়িদা- ৩)

এই আয়াতটি বিদায় হজ্জে শুক্রবার দিন আরাফার ময়দানে নাযিল হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত দীন কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) ধর্ম, (দুই) হুকুম-আহকাম। এখানে দীন বলে হুকুম-আহকাম বোঝানো হয়েছে। তাহলে আয়াতের মর্ম দাঁড়াল, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ দীনের উপর টিকে থাকতে যত হুকুম-আহকামের দরকার হবে তার সবকিছু পরিপূর্ণরূপে নাযিল করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবো, এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলোর বিধান কুরআনে পাওয়া যায় না। উদাহরণত ইঞ্জেকশন আধুনিককালের একটি আবিষ্কার। তো ইঞ্জেকশন ব্যবহারে রোযা ভাঙবে কিনা এর সমাধান আপনি কুরআনে পাবেন না। তাহলে দীনের হুকুম-আহকাম কিভাবে পরিপূর্ণ হল? এর উত্তর হল, আল্লাহ তা'আলা দীনের বিধি-বিধানসমূহকে দুটি পদ্ধতিতে কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন। এক. সংক্ষিপ্ত ও মূলনীতি আকারে। দুই. বিস্তারিত আকারে। তো যে বিধানটি বিস্তারিতভাবে এসেছে সেটা তো আছেই আর যে বিধানটি বিস্তারিতভাবে নেই সেটা আছে মূলনীতি আকারে। নবীজীর ইন্তেকালের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মদী যত সমস্যায় পড়বে, কুরআন বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদ ফকীহগণ কুরআনে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে তার সমাধান করে দিবেন। কুরআনী মূলনীতির আলোকেই তারা বলে দিবেন যে, এটা জায়েয, ওটা হারাম। এমন কোন সমস্যা আপনি দেখাতে পারবেন না যা কুরআনের ঐ বেসিক ল' তথা মূলনীতির দ্বারা সমাধান করা যাচ্ছে না। এখন বলুন, সাধারণ একজন মানুষ বাংলা অনুবাদ পড়ে কিভাবে মূলনীতি আর বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হবে এবং কিভাবে সে এর আলোকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান খুঁজে নিবে? সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এর জন্য তাকে কুরআন-সুন্নাহয় বিশেষজ্ঞ একজন আলেমের শরণাপন্ন হতেই হবে এবং কুরআন-সুন্নাহর ব্যাপারে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুসরণ করতে হবে। নতুবা তার কাছে দীনে ইসলাম আর পরিপূর্ণ মনে হবে না। তো এভাবে সূক্ষ্ম ও সংক্ষিপ্ত বিষয়াবলীতে একজন নির্ভরযোগ্য ও বিশেষজ্ঞ আলেমের ব্যাখ্যা মেনে দীন পালনের নামই হল মাযহাব মানা, যার কোন বিকল্প নেই।

সূরা মায়িদার তিন নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে পরিপূর্ণ করে দেয়ার ব্যাখ্যাা দিয়েছেন। যথা, أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ এই আয়াতের তাফসীরে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, (এক) أَطِيعُوا اللَّهَ দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন, (দুই) أَطِيعُوا الرَّسُولَ দ্বারা উদ্দেশ্য সুন্নাত, (তিন) أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য ইজমা।

ইমাম ও মুহাদ্দিসদের সময়কাল এবং ফকীহ-মুহাদ্দিস ও শুধু মুহাদ্দিসের পরিচয়

বর্তমানে সারা দুনিয়ায় যে চারটি মাযহাব চালু আছে এই চার মাযহাবের ইমামগণ সময় ও কালের বিচারে হাদীস সংকলন-কারীদের অগ্রজ। আমাদের ইমাম আবু হানীফা রহ. ছিলেন সবার আগের। তিনি দশজন সাহাবীকে স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি আর ইমাম মালেক রহ. একই যুগের মানুষ। তবে ইমাম আবু হানীফা রহ. যখন বয়োবৃদ্ধ, ইমাম মালেক রহ. তখন যুবক। ইমাম আবু হানীফা রহ. হজ্জ বা ওমরার সফরে মদীনায় গিয়ে ইমাম মালেক রহ. এর বাড়িতে মেহমান হতেন। কিতাবে আছে, ইমাম মালেক রহ. এর বাড়িতে মেহমান থাকাকালীন তিনি রাতে ঘুমাতেন না; সারা রাত ইমাম মালেক রহ. এর ফিকহ সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর সমাধান দিতেন। এ-ই কারণ যে, এই দুই মাযহাবের মধ্যে তেমন কোন মতপার্থক্য নেই।

ইমাম শাফেয়ী রহ. আমাদের ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর প্রধান দুই শাগরেদ ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. এর শাগরেদ। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর ছাত্র। ইমাম শাফেয়ী রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নাতি পর্যায়ের শাগরেদ। আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. তার পোতা পর্যায়ের শাগরেদ। ইমাম আবু হানীফা রহ. যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন ইমাম শাফেয়ী রহ. দুনিয়ায় আগমন করেছেন। তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে জীবদ্দশায় পাননি; পাবেন কি করে, তিনি তো তার ছাত্রের ছাত্র! আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. হলেন ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর ছাত্র।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের একটি দল কুরআন-সুন্নাহ হতে মাসআলা-মাসাইল আহরণ ও উদ্ভাবন করতে পারেন। তাদেরকে মুজতাহিদ ইমাম বলা হয়। আমাদের ইমাম সাহেবের প্রধান ছাত্র হলেন আবু ইউসুফ রহ.। তিনি আবু হানীফা রহ.-এর কাছে ফিকহ শিখতেন আর সুলাইমান ইবনে মেহরানের কাছে হাদীস শিখতেন। একবার সুলাইমান ইবনে মেহরানের দরবারে এক ব্যক্তি মাসআলা জানতে আসল। তিনি অপারগতা প্রকাশ করে আবু ইউসুফ রহ.-কে তার উত্তর দিতে বললেন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. তৎক্ষণাৎ সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন। সুলাইমান ইবনে মেহরান বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি কীভাবে বললে? তিনি বললেন, হুযূর! গতকাল আপনি যে হাদীসটি পড়িয়েছেন তার মধ্যেই তো এই মাসআলা আছে। তখন সুলাইমান ইবনে মেহরান খুশি হয়ে বললেন, يا معشر الفقهاء انتم الاتباء ونحن الصيادلة (অর্থ) হে ফকীহবৃন্দ! তোমরা হলে ডাক্তার আর আমরা কেবল ওষুধ বিক্রেতা। এ ঘটনা থেকে বোঝা গেল, কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শিতার পাশাপাশি হাদীস থেকে মাসআলাও আহরণ করতে পারতেন। তবে তাদের সকলেই একই সঙ্গে এ দুটি গুণের ধারক ছিলেন না।

ইয়াযীদ ইবনে হারুন রহ. ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ ছিলেন। একবার তিনি কোন এক মজলিসে বসা ছিলেন। তার সামনে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, যুহাইল ইবনে হারুন প্রমুখ বড় বড় ব্যক্তিবর্গ বসে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসল। উপস্থিতিদের সকলের বড় ছিলেন ইয়াযীদ ইবনে হারুন রহ.। তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন, মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এখানে এসেছো কেন? কোন আহলুল ইলমের কাছে যাও! আমরাতো আহলুল হাদীস। ঐ ব্যক্তি চলে গেলে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বললেন, আমরা এ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হিসেবে পরিচিত, তবু আমরা কি আহলুল ইলম নই? ইয়াযীদ ইবনে হারুন বললেন, না, তোমরা আহলুল ইলম নও! এরপর বললেন,

أنتم أهل الحديث وأهل العلم تلاميذ أبي حنيفة.

অর্থাৎ তোমরা হলে আহলুল হাদীস, আহলুল ইলম হল আবু হানীফার ছাত্রবৃন্দ। কাজেই ফতওয়া তারাই দিবে।

আলোচনা চলছিল, أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ দ্বারা ইজমা উদ্দেশ্য। নতুন কোন বিষয় জায়েয, না্া নাজায়েয তা বের করতে গিয়ে এই ফকীহগণ যদি কোন ব্যাপারে একমত হন তাহলে তাকে ইজমা বলে। যেমন, কোন একটা জিনিস নিজের আয়ত্বে নেয়ার পূর্বে তা বিক্রি করা নিষেধ– এ ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয়ের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। অথচ বর্তমানে জাহাজ সাগরে থাকা অবস্থায় মালামাল আমদানীকারকের আয়ত্বে আসার পূর্বেই তা বেচা-বিক্রি শুরু হয়ে যায়– যা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

ইজমা যে শরীয়তের দলীল তা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। সূরা নিসার **১১৫**নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ইজমার বিরুদ্ধাচরণ করবে তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। এই আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করার জন্য ইমাম শাফেয়ী রহ. চার চার বার কুরআনুল কারীম খতম করেছেন।

অথচ আহলে হাদীসরা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও ইজমা অস্বীকার করছে।

এরপর আছে فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ অর্থাৎ যদি কোন মাসআলার সমাধানের ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দেয় তাহলে তার সমাধান কিয়াসের মাধ্যমে হবে। কুরআনে আরো আছে, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ। তাফসীরের কিতাবগুলোতে এর দ্বারাও কিয়াস উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা দ্বারাও কিয়াস প্রমাণিত। ইয়ামান বিজিত হলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয ইবনে জাবাল রা.-কে সেখানকার গভর্ণর নিযুক্ত করলেন। তিনি ছিলেন আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকজন যখন তোমার কাছে মাসআলা জানতে আসবে তখন তুমি কীভাবে ফয়সালা দিবে? মু'আয ইবনে জাবাল বললেন, কুরআন দ্বারা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কুরআনে না পেলে? তিনি উত্তর দিলেন, সুন্নাত দ্বারা। রাসূল বললেন, সেখানে না পেলে? (তো যেহেতু নবীজীর যামানায় ইজমার প্রশ্নই আসে না, এজন্য) তিনি বললেন, সুন্নাতে না পেলে কিয়াস করব। অর্থাৎ সমস্যাটিকে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত অনুরূপ কোন বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে সমাধান বের করব। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৩৫৯৪ [নবাব সিদ্দীক হাসান খান *আররওযাতুন নাদাবিয়্যাহয়* এ হাদীসকে মাশহুর বলেছেন])

মোটকথা, সূরা মায়িদায় আল্লাহ তা'আলা বললেন, আজকে বিধি-বিধান পূর্ণ করলাম। আর সূরা নিসায় তার ব্যাখ্যায় বললেন, বিধি-বিধান পূর্ণ করলাম চার জিনিস দ্বারা। (এক) কুরআন, (দুই) সুন্নাত, (তিন) ইজমা এবং (চার) কিয়াস। এগুলোর মধ্যে আহলে হাদীসরা একটাও মানে না। কারণ ইজমা-কিয়াস কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু তারা তা মানে না। কাজেই কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিষয়াদি না মানলে কুরআন-হাদীস মানল কি করে? আলহামদুলিল্লাহ! আমরা চার মাযহাবও মানি, চারটি দলীলও মানি। ইজমা কিয়াস তথা মাযহাব মানার কারণ তারা আমাদেরকে বলে বে-ঈমান। আমরা কুরআন পুরা মানা সত্ত্বেও বেঈমান হয়ে গেলাম! তাহলে যারা কোনটিই পরিপূর্ণ মানে না তাদের ঈমানের কী অবস্থা!

আহলে হাদীসের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন

আহলে হাদীসের কাছে আমি কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করছি, পারলে তারা কিয়াস করা ছাড়া সরাসরি কুরআন-হাদীস দ্বারা এর উত্তর দিক।

উড়ন্ত বিমানে নামায পড়া যাবে কি না? ইঞ্জেকশন নিলে রোযা ভাঙবে কি না? শেয়ার ব্যবসা জায়েয আছে কিনা? এগুলোর উত্তর যেহেতু সরাসরি কুরআন-হাদীসে নেই এজন্য কিয়াস করা ছাড়া তারা এর উত্তর দিতে পারবে না। ডেসটিনি-২০০০ লি. জায়েয, না হারাম এর সমাধান কোন্ আয়াতে আছে তারা বলতে পারবে না। কেননা ডেসটিনির কথা তো কুরআনে নেই। এ জাতীয় হাজারো মাসআলা আছে যার বিবরণ কুরআন-হাদীসে সরাসরি নেই। অনুরূপভাবে ক্যামেরা দ্বারা ছবি তোলাসহ নিত্যনতুন হাজারো জিনিস আবিষ্কার হচ্ছে, যার বিবরণ কুরআন-হাদীসে কোথাও নেই, তারা এগুলোর ব্যবহারের বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কে জনগণকে কিভাবে অবহিত করবে? যদি তারা তা না পারে তাহলে তাদের কথা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার বাণী– আজ আমি ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলাম– বক্তব্যের বাস্তবতা কি রইল? দীন কিভাবে পূর্ণ হল? এভাবে তারা এই উভয় আয়াতকে অস্বীকার করল।

মাযহাব একাধিক হওয়ার কারণ

অনেকে প্রশ্ন করে– আমাদের ধর্ম এক, নবী এক তাহলে মাযহাব চারটি হবে কেন? আসলে মাযহাবের ভিন্নতা আল্লাহ তা'আলার এক অপার অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। এটা তার মর্জি অনুযায়ীই হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন মানুষের চলার পথ সহজ হোক। এজন্য তিনি তার যোগ্য বান্দাদের দ্বারা মাযহাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। চার মাযহাবকে জান্নাতে যাওয়ার চারটি পথের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ফলে যে কেউ যে পথ ধরেই এগোতে থাকুক অবশেষে জান্নাতেই প্রবেশ করবে। উদাহরণত চার মাযহাবের তিন মাযহাবেই উরু ঢেকে রাখা ফরয। কিন্তু মালেকী মাযহাবে ফরয নয়; মুস্তাহাব। প্রত্যেক মাযহাবের পক্ষেই হাদীসের রেফারেন্স আছে। তো এই মতপার্থক্যের ফায়দা হল, যারা মাঠে-ময়দানে, ক্ষেত-খামারে কাজ করে অনেক সময় তারা খেয়ালে-বেখেয়ালে হাঁটুর উপর কাপড় গুটিয়ে কাজ করে। তো ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাবের দিকে তাকালে তাদেরও মাফ পাওয়ার একটা উপায় লক্ষ্য করা যায়।

মোটকথা, মাযহাব আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী হয়েছে। আমাদের এ কথা বলার যথার্থ কারণও রয়েছে। লক্ষ্য করুন, কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ২২৮নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

অর্থ : তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন 'কুরু' পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। এখন আপনি যে কোন আরবী অভিধান খুলে দেখুন, সেখানে 'কুরু' শব্দের দু'টি অর্থ লেখা আছে। (এক) পবিত্রতা, (দুই) হায়েয। কিন্তু কুরআনে কারীমে 'কুরু' শব্দটি উক্ত দুটি অর্থের কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের কারও কারও মতে এখানে 'কুরু' শব্দটি 'পবিত্রতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর কারও কারও মতে 'হায়েয' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের এই মতপার্থক্যের কারণে পরবর্তীতে ইমামদের মধ্যেও মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। হানাফীরা বলেন, যে সকল সাহাবী 'কুরু' দ্বারা 'হায়েয' উদ্দেশ্য নিয়েছেন আমরা তাদের সঙ্গে একমত। আর শাফেয়ীরা বলেন, আমরা 'পবিত্রতা' অর্থ গ্রহণকারী সাহাবীদের সঙ্গে একমত। তো দেখা যাচ্ছে, কুরআন-সুন্নাহর যে সকল বক্তব্য একাধিক অর্থের ধারক এবং অর্থগুলোও বিপরীতধর্মী অর্থাৎ দুটোকে একই সঙ্গে গ্রহণ করা

সম্ভবপর নয়, অথচ আমল করার স্বার্থে দুটোর একটাকে গ্রহণ করতেই হবে– সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, যারা সকলেই ছিলেন নির্দ্বিধায় অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আর সেই মতপার্থক্যের সূত্র ধরেই পরবর্তীতে মাযহাবের ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এটা কেনই বা হবে না, মাযহাবের ইমামগণ তো ছিলেন দীন সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের মাযহাব তথা মতামতসমূহের সংকলক; নতুন মতের স্রষ্টা নন। আপনি মাযহাবের ইমামগণের মতপার্থক্য নিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখুন, যে কোন মাসআলায় তারা কোন মতামত ব্যক্ত করেছেন, তো তার পেছনে অবশ্যই কোন না কোন সাহাবীর মতামত উৎস হিসেবে কাজ করছে। তবে কথা ও কিতাব সংক্ষেপ করার সুবিধার্থে সাধারণত সেই সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয় না। এখন লক্ষ্য করুন, আমাদের আলোচ্য মাসআলায় এই যে সাহাবায়ে কেরামের মতপার্থক্য এবং ইমামদের ইখতিলাফ– এর ভিত্তি হল, আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত দ্ব্যর্থবোধক 'কুরু' শব্দটি। এখন বলুন, আল্লাহ তা'আলা কি জানতেন না যে, 'কুরু' শব্দটি দুটি অর্থের ধারক হওয়ায় উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ণয়ে তার নবীর সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ হবে এবং পরবর্তীতে উম্মতের মধ্যেও এই ইখতিলাফ সঞ্চারিত হবে? তো এই ইখতিলাফ যদি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী না হতো তাহলে তিনি কি 'কুরু' না বলে স্পষ্টভাবে 'হায়েয' বা 'পবিত্রতা' উল্লেখ করতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে বিপরীতমুখী দুটি অর্থের ধারক 'কুরু' শব্দটিই ব্যবহার করলেন। এতে বোঝা গেল, এই যে মাযহাব অর্থাৎ যোগ্য লোকের মতপার্থক্য এটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ীই হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও মাযহাবের প্রতি ইঙ্গিত ও মর্জি ছিল। উদাহরণত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাআতকে বনু কুরাইযার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি তাদেরকে বলে দিলেন, তোমরা বনু কুরাইযায় পৌঁছে আসরের নামায আদায় করবে। এটা বুখারী শরীফের ৪১১৯ নং হাদীস। সাহাবায়ে কেরাম বনু কুরাইযায় পৌঁছার আগেই আসরের সময় হয়ে গেল। এবার সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দুটি মাযহাব হয়ে গেল। কেউ কেউ বললেন, নামায কাযা হলেও আমরা ওখানে গিয়েই নামায আদায় করব। কারণ, নবীজীর কথা অমান্য করা যাবে না। সুতরাং তারা সফর অব্যাহত রাখলেন। আর কতক সাহাবা ছিলেন ফকীহ ধরনের, তারা বললেন, রাসূলের একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দ্রুতগতিতে গন্তব্যে পৌঁছা। তো এখন যেহেতু আমরা আসরের পূর্বে পৌঁছতে পারিইনি কাজেই নামায কাযা করা যাবে না। সুতরাং তারা সেখানে নামায আদায় করে নিলেন। পরে যুদ্ধ থেকে ফিরে তারা ঘটনাটি নবীজীকে জানালে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় মাযহাব তথা মতামতকে সমর্থন করলেন; কাউকেই তিরস্কার করলেন না। তাহলে দেখা গেল, নবীজী এখানে মাযহাবের ইচ্ছা করলেন। অন্যথায় তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলে দিতে পারতেন যে, কাযা হোক আর যাই হোক বনু কুরাইযায় পৌঁছেই তোমরা আছর পড়বে। তদুপরি তিনি উভয় মাযহাবকেই সমর্থন করলেন। সম্ভবত মাযহাবের ভিন্নতার ফলে উম্মতের জন্য দীন পালন করা সহজ হবে ভেবেই তিনি এমনটি করেছেন।

আরও দেখুন, কোন এলাকা বিজিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সেখানে গভর্ণর করে পাঠাতেন এবং তাদেরকে বলে দিতেন যে, ওখানকার লোকেরা দীনের ব্যাপারে তোমাকেই মুরুব্বী মানবে, তাদের আর মাসআলা-মাসাইল জানার জন্য মদীনায় আসা লাগবে না। মু'আয ইবনে জাবাল, হাকীম ইবনে হিযাম রাযি. প্রমুখ সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনাগুলো এর প্রমাণ। বলাবাহুল্য এভাবে যে সাহাবীকে যে অঞ্চলে পাঠানো হতো সে অঞ্চলে তার মাযহাব কায়েম হয়ে যেত। এর সরল অর্থ এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতজন ব্যক্তিকে গভর্ণর বানিয়েছিলেন প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব ছিল। চার খলীফার ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব ছিল। আবু বকর রাযি. এর মাযহাব হল, তারাবীহর নামায বাড়িতে পড়বে। আর উমর রাযি. এর মাযহাব হল, সকলেই মসজিদে এক ইমামের পিছনে নামায পড়বে। তবে কেউ বাড়িতে পড়লে তার ওপর আপত্তি করারও দরকার নেই। তো এ সকল মতভিন্নতা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে বড় বড় উলামায়ে কেরাম নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের এসব মতভিন্নতার দলীলভিত্তিক পর্যালোচনা করেছেন এবং একাধিক মতের একটিকে প্রাধান্য দিয়ে সেগুলো কিতাব আকারে একত্রিত করেছেন। ফলে বিভিন্ন মাযহাব সুবিন্যস্ত আকারে উম্মতের সামনে চলে এসেছে এবং একেক ইমামের সংকলিত মতামতগুলো ঐ ইমামের মাযহাব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

মাযহাব চার সংখ্যায় সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ

শুরুতে মাযহাব চারটিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তখন যেহেতু ইজতিহাদে পারদর্শী ইমামের সংখ্যা অনেক ছিল তাই মাযহাবের সংখ্যাও ছিল অনেক। আমরা এখন শুধু চার ইমামের চার মাযহাবের কথা জানি। অন্যান্যদের নাম অনেকেই জানি না। অথচ মাযহাব এ চারটি ছাড়া আরো ছিল। যেমন ইবনে শুবরুমার মাযহাব, ইবনে আবী লায়লার মাযহাব। অনুরূপভাবে ইমাম আওযায়ী, ইমাম সুফিয়ান সাওরী এরা সকলেই মাযহাবের ইমাম ছিলেন। তাদের মাযহাবও লোকেরা অনুসরণ করত। তাহলে পরবর্তীতে চারটিতে কিভাবে সীমাবদ্ধ হল? বস্তুত এটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই হয়েছে। তবে এর বাহ্যিক কারণ হল, প্রসিদ্ধ চার ইমাম ছাড়া অন্যদের মাযহাব সংকলনে যে সকল কিতাব লেখা হয়েছে তাতে দীনী সকল বিষয়ের সব সমস্যার সমাধান বিবৃত হয়নি। কিন্তু চার ইমামের কিতাবে প্রায় সব সমস্যার সমাধান সংকলিত হয়েছে। বলাবাহুল্য মানুষ যেখানে একসঙ্গে তার সব সমস্যার খুঁজে পেয়েছে, দীন পালনের জন্য সেদিকেই ঝুঁকে পড়েছে। অবশেষে মানুষের এই ঝোঁক চার মাযহাবে সীমিত হয়ে গেছে।

চার মাযহাবই হক, আমরা কোনটা মানবো

তারপর উম্মতের সর্বজনমান্য ব্যক্তিবর্গ এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এখন যদি কেউ ইসলাম অনুযায়ী চলতে চায় তাহলে এই চার ইমামের কোন একজনের সংকলিত মাযহাব অনুসরণ করতে হবে; মনমতো একেক মাসআলায় একেক ইমামের মাযহাব অনুসরণ করা যাবে না। আমাদের এ বক্তব্য হাদীসের আলোকেও প্রমাণিত যে, যে দেশে ব্যাপকভাবে যে মাযহাবের মুফতী পাওয়া যায় সে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিকে সে মাযহাব অনুসরণ করতে হবে।

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে হানাফী মাযহাবের মুফতী পাওয়া যায় তাই আমাদেরকে হানাফী মাযহাবই মানতে হবে। অন্য কোন মাযহাব মানা যাবে না। ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ মুফতী শাফেয়ী মাযহাবের তাই ওখানে শাফেয়ী মাযহাব, আর তিউনিসিয়া, মৌরিতানিয়ায় মালেকী মাযহাবের মুফতীগণ সংখ্যায় অধিক কাজেই সেখানে মালেকী মাযহাব মানতে হবে।

ইমাম আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ. শাফেয়ী মাযহাবের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বড় আলেম ছিলেন। তিনি বলেন, একবার মুকাশাফার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে হাশরের ময়দান দর্শন করিয়েছেন। দেখলাম, হাউযে কাউসারের সবচে' কাছে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর গম্বুজ। এর কিছুটা দূরে ইমাম মালেক রহ. এর গম্বুজ। তার কিছুটা দূরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর গম্বুজ। তার কিছুটা দূরে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর গম্বুজ। এই ঘটনা ইমাম আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ. এর কিতাবেও আছে, অনুরূপভাবে শাইখ যাকারিয়া রহ.এর কিতাব *শরীয়ত আওর তরীকত কা তালাযুম* এর মধ্যেও আছে। কিন্তু এই মুকাশাফার পর তো আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ. এর শাফেয়ী মাযহাব ছেড়ে হানাফী মাযহাবে চলে আসার কথা ছিল। কিন্তু তিনি মাযহাব পরিবর্তন করেননি, করতে পারেননি। কারণ তিনি যে এলাকায় থাকতেন সেখানে সকলেই শাফেয়ী ছিল।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ., আমরা হাদীস পড়াতে গিয়ে যার সনদ বর্ণনা করি, তিনি কুতুবে সিত্তাহর কিতাব পড়েছেন মক্কা-মদীনায়। তার সকল উস্তাদ শাফেয়ী এবং মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার সকল উস্তাদ যেহেতু মালেকী এবং শাফেয়ী তাই আমার মন চাইতো আমি এ দুই মাযহাবের কোন একটি অনুসরণ করি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইলহাম করে বলে দিয়েছেন, হে ওয়ালীউল্লাহ! তুমি যেহেতু হিন্দুস্তানে বসবাস করছো এবং এখানকার লোকেরা বহুকাল পূর্ব থেকে হানাফী মাযহাব মেনে আসছে, কাজেই তুমিও হানাফী মাযহাব অনুসরণ কর। তাহলে বোঝা গেল, মাযহাব আল্লাহ তা'আলার ইশারায় হয়েছে। রাসূলের ইঙ্গিতে হয়েছে।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম যারা বড় বড় হাদীসের কিতাব সংকলন করেছেন তারা সকলেই মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কুতুবে সিত্তাহর সকল লেখক মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমাম বুখারী রহ. শাফেয়ী মাযহাবের ছিলেন। কারণ তার পিতৃপুরুষগণ পূর্ব থেকেই শাফেয়ী মাযহাবের ছিলেন। বড় বড় তাফসীর গন্থের লেখকগণও মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ফিকহের সকল কিতাব মাযহাবের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। *হিদায়া* কিতাব হানাফী মাযহাবের উপর লেখা, শাফেয়ী মাযহাবের কিতাব *কিতাবুল উম্ম*, মালেকী মাযহাবের কিতাব *আলমুদাউওয়ানাতুল কুবরা*, হাম্বলী মাযহাবের কিতাব *আলমুগনী*।

ফিকহ আর সুন্নাত অভিন্ন অর্থের ধারক। সুতরাং ফিকহও মানতে হবে। এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

رب حامل فقه غير فقيه.

অর্থাৎ অনেক মুহাদ্দিস এমনও আছেন যারা ফকীহ নয়, তারা যদি হাদীসের শব্দগুলো সঠিকভাবে উম্মতকে পৌঁছে দেয় তো এটাও দীনের অনেক বড় খিদমত হবে। কারণ হাদীসটি কোন ফকীহর কাছে পৌঁছলে তিনি এর আলোকে অসংখ্য মাসআলা বের করতে সক্ষম হবেন। মোটকথা হাদীস, ফিকহ, তাফসীর সকল কিতাবের লেখক মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এমনকি যে শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা হয় সেই উলূমুল হাদীসের সকল লেখকও মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। উদাহরণত ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. শাফেয়ী মাযহাবের ছিলেন।

হাদীস-উলূমুল হাদীস, তাফসীর-উসুলে তাফসীর, ফিকহ-উসুলে ফিকহসহ দীনের মৌলিক কোন শাস্ত্রে বর্তমানের নামধারী আহলে হাদীসদের লেখা কোন প্রামাণ্য কিতাব নেই। এসব শাস্ত্রের সকল প্রামাণ্য কিতাব মাযহাবী উলামায়ে কেরামের লেখা। থাকলে ওরা দেখাক যে, অমুক প্রামাণ্য কিতাবটি তাদের কোন পণ্ডিতের লেখা। দেখাতে পারবে না। যারা হাদীস সংকলন করেছেন তারা সকলেই মাযহাবী আলেম ছিলেন; আহলে হাদীসের ফতওয়া অনুযায়ী তারা মুশরিক। আমাদের প্রশ্ন হল, মুহাদ্দিসীনে কেরামকে মুশরিক ফাতাওয়া দিয়ে কোন মুখে আবার মুশরিকের কিতাব দিয়ে দলীল দেয়? আশ্চর্যের কথা! তাফসীর-ওয়ালারা মুশরিক, উসূলে হাদীস-ওয়ালারা মুশরিক, সকল ফিকহের লেখক মুশরিক! তাহলে তাদের কিতাব পড় কেন? তোমাদের জন্য তাদের কিতাব দ্বারা হাদীস যাচাই করা জায়েয আছে? কোন হিন্দু যদি ইসলাম সম্পর্কে কিতাব লেখে তাহলে তার কিতাব দ্বারা কি দলীল দেয়া জায়েয হবে?

মাযহাব মানার একটা বড় ফায়দা হল, সুন্নাত তরীকায় পূর্ণ শরীয়তের উপর আমল হয়ে যায়। নামাযে তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত কোন পর্যন্ত উঠাবে এ ব্যাপারে দু' রকম হাদীস আছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, কান পর্যন্ত উঠাবে আর অন্যটায় কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। দুটোই সুন্নাত এবং দুটোই আমলযোগ্য হাদীস। তাহলে তারা কোনটা মানবে! ওরা কাঁধ পর্যন্ত উঠায় ফলে মাত্র একটি হাদীসের উপর আমল করে। আর আমাদের ইমাম সাহেব বলেছেন, পুরুষরা হাত কান পর্যন্ত উঠাবে এতে কান পর্যন্ত উঠানোর হাদীসের উপর আমল হয়ে যাবে। আর মহিলারা কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে এতে কাঁধ পর্যন্ত উঠানোর হাদীসের উপরও আমল হয়ে যাবে। তো দেখা যাচ্ছে, মাযহাব মানার ফলে আমরা দুটি হাদীসের উপরই আমল করতে পারছি। আর ওরা হাদীস মানার দাবীদার হয়ে একটির ওপর আমল করছে।

সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে আছে,

لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب.

অর্থ: ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না। আবার ত্বহাবী শরীফ ও মুআত্তা ইমাম মালিকে আরেকটা হাদীস আছে,

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.

অর্থ : যার ইমাম আছে তার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট।

আমরা মাযহাব মানি, এজন্য আমরা বলি, এ দুটোর প্রথম হাদীসটি ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য; মুকতাদীর জন্য নয়। আর দ্বিতীয় হাদিসটি মুক্তাদির জন্য।

ওরা বলে, সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না। তাহলে তাদেরকে প্রশ্ন করুন, তাদের কোন ব্যক্তি যদি এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হয় যখন ইমাম সাহেব রুকুতে চলে গেছেন, তখন সে কি করবে? সে কি ইমামের সঙ্গে নামাযে শরীক হয়ে যাবে, নাকি সূরা ফাতিহা পড়বে। যদি সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায না হয়, তাহলে ফাতিহা না পড়ে রুকুতে গেলে তো তার নামায হবে না। আর যদি এখন শরীকও হতে চায় আবার সূরা ফাতিহাও পড়তে চায় তাহলে সেটা রুকুর মধ্যে পড়তে হবে। অথচ হাদীসে রুকু ও সিজদায় কিরাআত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

(১০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

কা'বার পথের পাথেয়

মাওলানা মাহমূদুল আমীন

মুমিনমাত্রই হজ্জের স্বপ্ন দেখে। প্রতিটি মুমিন হৃদয় ব্যাকুল থাকে বাইতুল্লাহর আকাঙ্ক্ষায়। ডানা মেলে উড়ে যেতে চায় সুদূর মক্কায় আর সোনার মদীনায়। অনেকের স্বপ্নপূরণ হয়, বিমানের ডানায় ভর করে হাজির হয় বাইতুল্লাহর ছায়ায় এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক রওযায়। এবারো অনেকের স্বপ্নমুকুল পূর্ণ ফুলরূপে বিকশিত হচ্ছে। তাদের স্বপ্নফুলের সৌরভে পরিবেশ এখন সুরভিত। দিকে দিকে বসছে হজ্জের পাঠশালা। ভেসে আসছে তালবিয়ার সুমধুর গুঞ্জরণ। ইতিমধ্যেই সফেদ কাফেলা বুকে নিয়ে হজ্জের বিমানগুলো মক্কা-মদীনার পথে উড়াল দিয়েছে। হজ্জের সফর ইশ্‌ক, মহব্বত আর আবদিয়্যাতের মূর্ততায় বিভাসিত হওয়ার সফর। বক্ষ্যমান নিবন্ধে এই বরকত পরশিত সফরের কয়েকটি আদব বাইতুল্লাহর সম্মানিত মুসাফিরগণের খিদমতে পেশ করা হলো।

যে মহামহিমের নিখাদ প্রেমের অনাবিল হাতছানিতে আমি পাগল হয়েছি, আশেক বেশে কা'বার পথে ছুটে চলেছি স্বয়ং তিনিই বলেছেন,

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

অর্থ : হজ্জের জন্য সুবিদিত কয়েকটি মাস রয়েছে। সে মাসগুলোতে যাদের উপর হজ্জ ফরয হয়েছে তারা যেন হজ্জের সময় অশ্লীলতা, পাপাচার এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। তোমরা যে সকল ভালো আমল করো আল্লাহ তা'আলা তা জানেন। (হজ্জের জন্য) পাথেয় সংগ্রহ করো। আর সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়ার পাথেয়। হে জ্ঞানীসকল! তোমরা আমাকেই ভয় করো। (সূরা বাকারা- ১৯৭)

বাইতুল্লাহর মুসাফিরগণের সর্বপ্রথম করণীয় হলো, খালেস দিলে তওবা করে নেয়া। অনুতাপের অশ্রুতে অতীতের পাপগুলোকে ধুয়ে ফেলা। গুনাহ ও গুনাহের উপকরণ থেকে দূরে থাকা এবং ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

অনেকেই মনে করেন, হজ্জ আদায়ের পর সকল গুনাহ বর্জন করবো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হজ্জে যাওয়ার পূর্বেই সকল গুনাহ ছেড়ে দাও এবং তাকওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করে আমার ঘরের মেহমান হও। এজন্য প্রত্যেক হজ্জযাত্রী বাহ্যিক দেহে লিবাসুল ইহরামের শুভ্রতা ধারণের পূর্বেই হৃদয় মিনারকে আল্লাহর মহব্বত ও তাকওয়ার শুভ্রতায় আলোকময় করতে সচেষ্ট হবেন। রাতের শেষ প্রহরসহ দু'আ কবুলের মুহূর্তগুলোতে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আও করবেন, যেন হজ্জের এ সফরটি তাকওয়ার সফর হয়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফরে বের হতেন তখন এভাবে দু'আ করতেন,

اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা এ সফরে নেকী, তাকওয়া এবং আপনি সন্তুষ্ট হবেন এমন কাজ করার তাওফীক প্রার্থনা করছি। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩৩৩৯)

হযরত জা'ফর সাদেক রহ. বলেন, হজ্জ পালনকারীর উপর সর্বদা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নূর বিদ্যমান থাকে যতক্ষণ না সে গুনাহে লিপ্ত হয়। এজন্য আমরা হজ্জের সফরকে অবশ্যই সকল গুনাহ থেকে মুক্ত করে আল্লাহর নূরের ঝর্ণাধারায় স্নাত থাকবো ইনশা-আল্লাহ।

আমাদেরকে অবশ্যই হালাল সম্পদ দ্বারা হজ্জ করতে হবে। হজ্জের সফরের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হালাল অর্থ থেকেই করতে হবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ان الله طيب لايقبل الا طيبا

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, পবিত্রকেই তিনি কবুল করেন। (সুনানে তিরমিযী; ১হা.নং ২৭৯৯)

নিয়তকে অবশ্যই খাঁটি করে নিতে হবে। আমার হজ্জ ও মদীনা যিয়ারত যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়; লৌকিকতা ও যশ-খ্যাতির জন্য না হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

অর্থ : মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বাইতুল্লাহর হজ্জ করা আবশ্যক, যে বাইতুল্লাহ পৌঁছার সামর্থ্য রাখে। (সূরা আলে ইমরান- ৯৭)

অন্যত্র বলেন,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

অর্থ : তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য বাইতুল্লাহর হজ্জ ও উমরা আদায় করো। (সূরা বাকারা- ১৯৬)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন,

اللهم حجة لارياء فيها ولا سمعة

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার হজ্জকে রিয়া ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষামুক্ত হজ্জরূপে কবুল করুন। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২৮৯০, সহীহ বুখারী; হা.নং ১৫১৮)

সুতরাং সুনাম-সুখ্যাতি হবে, হাজী লকব কাজে লাগিয়ে ভোট বা নোট কামানোর প্রতিযোগিতায় সুবিধা করা যাবে ইত্যাদি পার্থিব স্বার্থচিন্তা যেন আমাদেরকে স্পর্শ না করে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিলই যেন হয় আমার কামনা। সুন্নাতের অনুসরণই হয় যেন আমার বাসনা।

হুকুকুল্লাহ তথা আল্লাহ তা'আলার কোন হক যদি যিম্মায় থাকে যেমন: নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি অনাদায় থেকে থাকে তাহলে এখন থেকেই নামায, রোযার কাযা আদায় শুরু করা এবং যাকাত আদায় করে দেয়া। আল্লাহর ঘর যিয়ারতের আগেই আল্লাহ তা'আলার হকগুলো আদায়ে সচেষ্ট হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য।

অনুরূপ হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হকসমূহও আদায় করে দেয়া আমাদের অপরিহার্য দায়িত্ব। বান্দার হক দু ধরনের (এক) আর্থিক হক। আমার যিম্মায় যদি কারো ঋণ ইত্যাদি থাকে তা পরিশোধ করে হজ্জে যাবো। যদি এখন আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে হকদারের কাছে বলে অনুমতি নিয়ে যাবো। পরিবারে সদস্যগণের কাছে এ ব্যাপারে ওসিয়তও লিখে রেখে যাবো। যদি আল্লাহর রাস্তায় হজ্জের মুবারক সফর আমার পরকালের সফরে পরিণত হয় তাহলেও যেন তারা এ সকল হক আদায় করে দিতে পারে। ওসিয়তনামায় শুধু ঋণই নয় বরং আমার হক কারো যিম্মায় থাকলে তাও লিখে রাখবো, যাতে

আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের ওয়ারিশদের হক বিনষ্ট না হয়। আর্থিক লেনদেন ছাড়াও পরিবারের লোকজনকে তাকওয়া-ত্বহারাত, নামায-রোযা ইত্যাদির ব্যাপারেও আমরা ওসিয়ত করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়ত লেখার প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৬২৭) যাকাত ইত্যাদি অনাদায়ী থাকলে তারও ওসিয়ত করে যাবো।

(দুই) আমার দ্বারা যদি কারো সম্মানের হানি হয়, আমার আচরণ ও উচ্চারণে যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকে তাহলে তার কাছ থেকে মাফ নিয়ে যাই। হজ্জে যাওয়ার পূর্বে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নির্বিশেষে সকলের কাছে দু'আ চাওয়া ও মাফ নিয়ে যাওয়া উচিত। সুনির্দিষ্টভাবে যদি জানা থাকে যে, অমুক ব্যক্তি আমার কোন আচরণ বা উচ্চারণে কষ্ট পেয়েছে তাহলে তার কাছে বিশেষভাবে মাফ নিয়ে নেয়া আবশ্যক।

হজ্জে যাওয়ার পূর্বেই হজ্জের মাসআলা-মাসাইল ও হারামাইন শরীফাইনের আদবসমূহ ভালোভাবে জেনে নিবো। সম্ভব হলে আহলে দিল আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কেরামের সাথে হজ্জ পালনের চেষ্টা করবো। নির্ভরযোগ্য আলেমের লেখা হজ্জ বিষয়ক মাসাইলের কিতাবও সম্ভব হলে সাথে রাখবো। হজ্জের সফর দু'আ কবুলের সফর। এজন্য হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. রচিত *মুনাজাতে মাকবূল* নামক গ্রন্থখানা অবশ্যই সাথে রাখতে সচেষ্ট হবো। এ গ্রন্থটির নির্ভরযোগ্য বাংলা সংস্করণ যে কোন লাইব্রেরীতেই পাওয়া যাবে। এতে কুরআন-হাদীসের বহু দু'আ তিনি সন্নিবেশিত করেছেন। হজ্জের সফরে এ গ্রন্থে উল্লিখিত দু'আগুলো গুরুত্বের সাথে করার দ্বারা আপনার জীবনে দুনিয়া-আখিরাতের সাফল্যের অনন্ত দুয়ার খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ।

লিবাসুল ইহরামের শুভ্রতা ধারণের পর তালবিয়া পাঠে নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত রাখবো। মনে করবো কাফনের কাপড় পরিধানের পর আর তো ফোন করা যাবে না, তাহলে এখন কেন ইহরাম বাঁধার পর তালবিয়া না পড়ে ফোন নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছি। আমি তো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক গড়তে যাচ্ছি, সুতরাং যে কাজে আল্লাহ খুশি হবেন সে কাজেই আমাকে মগ্ন থাকতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, তালবিয়া পাঠকারীর সাথে সাথে পথের দুপাশের সকল বস্তুও তালবিয়া পাঠ করতে থাকে। (আলমু'জামুল কাবীর; হা.নং ৫৭৪১)

পুরো সফরে আল্লাহ তা'আলার ধ্যান খেয়াল অন্তরে জাগরুক রাখবো। গাফলতি, উদাসীনতা ও দুনিয়াবী চিন্তা-ভাবনা যেন আমাকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করতে না পারে। বিশেষ বিশেষ স্থান যেমন, হারামাইন শরীফাইন, মিনা, মুযদালিফা, আরাফার মত অতীব মর্যাদাপূর্ণ স্থানগুলোতে যেন আমার একটি মুহূর্তও অযথা না কাটে। উলামায়ে কেরামের মতে আরাফার ময়দানে আঁখিযুগল আল্লাহর ভয় ও ভালবাসায় অশ্রুসিক্ত হওয়া হজ্জ কবুলের একটি আলামত। অনেকে গল্প-গুজব করে ও মোবাইলে কথা বলে হীরা-জহরতের চেয়েও মূল্যবান এ সময়গুলোকে নির্দয়ভাবে নষ্ট করে থাকে। কেউ কেউ তো তাওয়াফ, উমরা ইত্যাদির ফিরিস্তি সরাসরি বা ফোনে সম্প্রচার করতে থাকে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এর মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ স্থান ও কালের অসম্মানও হচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর শা'আয়েরের সম্মান বজায় রাখে তা তো তার অন্তরের তাকওয়া প্রসূত। (সূরা হজ্জ- ৩২)

বাইতুল্লাহ, সাফা-মারওয়া, মিনা, মুযদালিফা, আরাফা, মসজিদে নববী সবই আল্লাহ তা'আলার শা'আয়ের (নিদর্শন)। সুতরাং এ সকল স্থানের সম্মান-মর্যাদার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। বরকত পরশিত এ সকল স্থানগুলোতেও অনেককে সেলফি তোলার মত গর্হিত কাজে লিপ্ত হতে দেখা যায়। অনেকে আবার জাবালে রহমত, গারে হেরা প্রভৃতি স্থানে নিজের নাম লেখার মত বিদআত কর্মেও প্রবৃত্ত হয়, যা অবশ্যই পরিতাজ্য।

কা'বার পথিকগণ যুয়ূফুর রহমান (আল্লাহ তা'আলার মেহমান), তাঁদের সবার সাথে অবশ্যই সদাচরণ করতে হবে। সাধ্যানুযায়ী তাঁদের খিদমত করাকে নিজের জন্য গনিমত মনে করতে হবে। তাদের থেকে কোন খিদমত নেবো না। এমনকি তাদের থেকে খিদমতের আশাও করবো না। সবার সাথে নম্র ব্যবহার করবো। আমার কোন আচরণ ও উচ্চারণে আল্লাহর ঘরের কোনো মুসাফির যেন কষ্ট না পান সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবো। উঁচুস্বরে কথা বলে কিংবা তওয়াফ, সায়ীসহ হজ্জের আমলসমূহ পালনকালে আমি কাউকে কষ্ট দেব না। অনেকে অযথা ধাক্কাধাক্কি করে যা সম্পূর্ণ নিষেধ। পুরো সফরে আমাদেরকে ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে লোক সকল তোমরা ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ইবাদত করো। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৬৭১)

হজ্জের সফরে পদে পদে ঝগড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু কারো সাথে বিলকুল ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হবো না। মনে করবো আল্লাহ তা'আলা আমার সবরের পরীক্ষা নিচ্ছেন, এই পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। আমার সাথে কেউ কোনো অযাচিত আচরণ করে ফেললে সবর করবো এবং অন্তর থেকেই তাকে মাফ করে দেবো। আমরা নিজেদের মেহমানের খাতিরে অনেক সময় অনেক কষ্ট হাসিমুখে বরদাস্ত করে থাকি তাহলে রহমানের মেহমানের খাতিরে কি অতটুকু সবরও করতে পারবো না?

হজ্জের সফরে সামর্থ্য অনুযায়ী দান সদকাও করবো। বিশেষ করে কোন হাজী সাহেবের কোন আর্থিক সমস্যা বুঝতে পারলে সাধ্যানুযায়ী তার প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করবো। বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ মুসলমানের সাথে সাক্ষাত হবে, পারলে তাদের সাথে সালাম মুসাফাহা করবো। তাদেরকে মেহমানদারী করাবো। হিকমতের সাথে তাদের মাঝে আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবো। হজ্জের জরুরী মাসাইল সম্পর্কে কেউ অবগত না থাকলে উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে তাকে প্রয়োজনীয় মাসাইল সম্পর্কে অবগত করানোর চেষ্টা করবো। সবার হজ্জ যেন মাবরূর হয়, নেকিওয়ালা হয় সে জন্য দু'আও জারী রাখবো।

সোনার মদীনায় প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযায় হাজির হওয়ার আগেই নিজের জীবনকে পরিপূর্ণ সুন্নাতের উপর ওঠানোর চেষ্টা করবো। আমার চেহারা-সূরত, পোশাক-পরিচ্ছদ যেন সুন্নাহ মুতাবিক হয় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবো। মদীনার কোন মানুষ যেন আমার আচরণে সামান্যতম কষ্টও না পায় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবো। মদীনায় থাকাকালে নিচু আওয়াজে কথা বলবো। যবানকে দুরূদ, যিকির ও তিলাওয়াত দ্বারা সিক্ত রাখবো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত, সূরত ও সারীরাত (উম্মাহর প্রতি অন্তরের দরদ ও মায়ার গুণ) দ্বারা নিজের জীবনকে সজ্জিত করতে সচেষ্ট হবো।

হজ্জ ও যিয়ারত শেষে যখন দেশে ফিরে আসবো তখন তো আমি সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ। আমার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে হজ্জ করলো, হজ্জের সফরে কোন গুনাহ করলো না, সে যেন সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় ফিরে এলো। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৮১৯)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, হজ্জ তার পূর্বে সংঘটিত সকল গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩৩৬)

সুতরাং বাকি জীবন গুনাহমুক্ত থাকতে চেষ্টা করবো। ইবরাহীমী চেতনায় উদ্বেলিত হয়ে শিরক, বিদআত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবো। একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হবো। উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, হজ্জ-পরবর্তী জীবনে যদি কেউ পূর্বের জীবন থেকে বেশী আল্লাহ ও পরকালমুখী হয় তাহলে এটি একটি আলামত যে, তার হজ্জ কবুল হয়েছে।

হজ্জ থেকে ফিরে এসে হজ্জের সফরের দুঃখ-কষ্টের বিষয়ে আলোচনা করবো না। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. লিখেছেন, একটি উদাসীনতা, যার ক্ষতি ব্যাপক হওয়ার কারণে বিষয়টি খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবী রাখে। তা হল, কতক লোক হজ্জ থেকে ফিরে এসে সেখানকার দুঃখ-কষ্ট এমনভাবে বর্ণনা করে যে, শ্রোতাদের অন্তরে হজ্জের প্রতি একটা ভয় ঢুকে যায়। এসব লোক আল্লাহর পথে মানুষকে বাধাদানকারীর শামিল। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

অর্থ : আর যারা আল্লাহর পথে বাধাদান করে...। (সূরা আনফাল- ৪৭)

এই আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে এদের মধ্যে এ সকল লোকও অন্তর্ভুক্ত ...। হজ্জের সফরে কিছু কষ্ট হলেও তো হাসিমুখে তা বরণ করে নিতে হয়। কারণ এটি তো সাধারণ কোন সফর নয়। এটি তো ইশক ও মুহাব্বতের, প্রেম ও ভালোবাসার সফর। প্রিয়তমের সাথে সাক্ষাতের সফরে পথের কাঁটাও তো ফুল হিসেবে বরণ করে নিতে হয়। কবি বড় সুন্দর বলেছেন,

در رہ منزل لیلی خطرہاست بجاں- شرط اول قدم اں ست کہ مجنوں باشی-

অর্থ : প্রেমাস্পদের কাছে যাওয়ার পথে রয়েছে অনেক বাধা, সে পথে পা বাড়ানোর প্রথম শর্তই হচ্ছে তোমাকে পাগল হতে হবে। (মা'আরিফে হাকীমুল উম্মত; পৃষ্ঠা ৩৯৫, মাসিক আলকাউসার; বর্ষ ১০; সংখ্যা ৯)

হজ্জ থেকে ফিরে এসে শ্রোতাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং বাইতুল্লাহর প্রতি আগ্রহ পয়দা হয় এমন আলোচনা করবো। বাইতুল্লাহর মুহাব্বত, মদীনার ভালোবাসা, আল্লাহর রহমত, বরকত ও কুদরতের কথা মানুষকে শুনিয়ে শুনিয়ে হজ্জের প্রতি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবো। মক্কা-মদীনার বাহ্যিক জৌলুস সম্পর্কেও আলোচনা করে সময় নষ্ট করবো না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের হজ্জ কবুল করুন। আমাদেরকে বার বার তাঁর ঘরের মুসাফির হওয়ার তাওফীক দিন। যারা বাইতুল্লাহ যিয়ারতের স্বপ্ন দেখে তাঁদের সকলের স্বপ্নকে আল্লাহ তা'আলা পূরণ করে দিন। আমীন।

লেখক : মুদীর, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া,
বছিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

(৭ পৃষ্ঠার পর, আহলে হাদীসের বিভ্রান্তি)

তাহলে তাদের মতানুসারে এই ব্যক্তি যদি নামাযে শরীক হয় তাহলে তার এই রাকাআত গৃহিত হবে না। তবে কি এই ব্যক্তি এই রাকাআতে শরীক না হয়ে পরের রাকাআতে শরীক হবে? না, সে এটাও পারবে না। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ ইমামকে নামাযের যেখানে পাবে সেখানেই তার সঙ্গে শরীক হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি রুকু পাবে সে রাকাআত পেয়ে যাবে। আর যে রুকু পাবে না সে রাকাআত পাবে না। পক্ষান্তরে মাযহাব মানলে এ জাতীয় কোন সমস্যাই নেই। কেননা আমাদের ইমাম সাহেব উক্ত সব হাদীসের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছেন, এই ব্যক্তি যেহেতু মুক্তাদি তাই ইমামের ফাতিহাই তার ফাতিহা বলে গণ্য হবে, তাকে আর একাকি ফাতিহা পড়তে হবে না। বরং সে নবীজীর নির্দেশ মুতাবেক ইমামের সঙ্গে নামাযে শরীক হয়ে যাবে এবং রুকু পেয়েছে বিধায় রাকাতটিও পেয়ে যাবে।

তারা আমীন জোরে বলে, না আস্তে বলে? জোরে বলে। তাহলে শুনুন, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. তখন গভর্নর। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার হাতে মুসলমান হলেন। তার নাম ছিল ওয়াইল ইবনে হুজর। মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. তাকে বললেন, তুমি তো অনেক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যাও। তোমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেক কাজ নিবেন। হযরত মুআয রা. এর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি নবীজীর সান্নিধ্যে মদীনায় গেলেন। তিনি সেখানে বিশ দিন অবস্থান করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি যা করি তুমি তা দেখ। তিনি সেখানে ৪০ ওয়াক্ত নামায আস্তে কিরাআতে পড়লেন। অর্থাৎ ২০ দিনের যোহর-আছর। আর ৬০ ওয়াক্ত নামায জোরে কিরাআতে, অর্থাৎ মাগরিব, ইশা ও ফজর। এতগুলো নামাযের মধ্যে ৫৭ ওয়াক্ত নামাযে নবীজী আমীন শব্দটি আস্তে বললেন আর মাত্র তিন ওয়াক্ত নামাযে জোরে বললেন। তখন ওয়ায়েল ইবনে হুজর বুঝলেন, আমীন আস্তে বলাই মূল নিয়ম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক ওয়াক্তে জোরে বলেছেন আমীন কোথায় বলতে হবে তা শিক্ষা দানের জন্য। সুতরাং শেখানোর জন্য অর্থাৎ কোন নওমুসলিম যদি পিছনে থাকে তবে এক দুই ওয়াক্ত আমীন জোরে বলা যেতে পারে।

তো এই দু' তিনটি উদাহরণ দ্বারা আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, মাযহাব মানলে সকল হাদীসের উপরই আমল হয়ে যায়। আর নিজে নিজে পণ্ডিত সাজলে একটা ধরলে দশটা হাতছাড়া হয়ে যায়। সার কথা হল, মানুষের মধ্যে বিবেক-বিবেচনা বলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে হেদায়াতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আর কেউ যদি জিদ করে বসে যে, যে যত সত্যই আমার সামনে পেশ করুক আমি তো ভ্রান্তির উপর অটল থাকবই তাহলে তার হেদায়াত পাওয়ার পন্থা আমাদের জানা নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হক্কানী উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্যে থেকে সঠিক পথের ওপর কায়েম ও দায়েম থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিচিতি : শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।
বিশিষ্ট খলিফা, মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা শাহ
আবরারুল হক রহ.

মনের পশুরে করো জবাই (!)

বিনজামির

একজন মুসলিম তার যাপিত জীবনে দীনী অনুশাসন মেনে চলবে- এটিই তার সহজাত জীবনচিত্রের দাবি। প্রবৃত্তির তাড়নায় কখনো সে বিধান পালনে শিথিল হলেও অনুশাসনিক বিধান-নীতির ব্যাপারটিতে তার বিশ্বাস থাকবে চিরসবুজ, অমলিন। এর ব্যত্যয় ঘটলে মুসলিম তালিকায় তার নামটি খুঁজে পাওয়া বেশ দুরুহ হয়ে পড়বে। উযহিয়্যা কিংবা কুরবানী চিরায়ত একটি মুসলিম অনুশাসনিক বিধান। যুগ যুগ ধরে ফি বছর মুসলিম সমাজে বিধানটি পালিত হয়ে আসছে। উযহিয়্যা বিধানটি মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের নিকট এমন কোনো লঘু মানের বিষয় নয় যার অস্তিত্ব কিংবা সত্যাসত্যি নিয়ে তারা মতবৈচিত্রের নিগড়ে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাবেন। কুরআন, হাদীস এবং সাহাবা ও তাবেয়িদের বাণী-সমগ্রে এ সংক্রান্ত প্রচুর পরিমাণ নীতি-বিধান বিবৃত হয়েছে। ইসলামী শরীয়ার একটি স্বীকৃত নীতি হলো, ইসলামী বিধান সংক্রান্ত বিদ্রুপাত্মক আচরণ ব্যক্তিকে ঈমান থেকে দূর সীমানায় নিক্ষেপ করে। ইসলামের গণ্ডির সাথে তার আর সাক্ষাৎ মেলে না। বাৎসরিক কুরবানী উৎসবের নিগূঢ় তাৎপর্য হলো, নিজের ভিতরকার যাবতীয় পাশবিকতাকে সমূলে অপসারণ করে দেহমনকে আল্লাহ সমীপে সঁপে দেয়া। সুতরাং এটি কুরবানী উৎসবের অতি প্রয়োজনীয় কাঙ্ক্ষিত একটি ফল। বৃক্ষ বিনে যেমন ফলের দেখা মেলে না তেমনি কুরবানী বিধান পালন ব্যতিরেকে এর ফল অর্জনে নিরত হওয়াটা এক প্রকার বাতিকগ্রস্ততা কিংবা ভীমরতি বৈ কিছুই নয়। আজকাল কুরবানী ঈদের সময় ঘনিয়ে এলে সামাজিক মাধ্যমগুলোতে রং চড়ানো এক শ্রেণীর বুলি বেশ চাউর হয়ে উঠে। যথা: পশুত্বের কোরবানী চাই, মনের পশুরে করো জবাই, প্রভৃতি। আপাত দৃষ্টিতে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন এ জাতীয় ব্যাপারগুলোতেই كلمة حق أريد بها باطل বাগধারাটি প্রচলিত হয়। বাংলা বাগধারায় এর তরজমা দাঁড়ায় 'কথা সত্য মতলব খারাপ'। ৩৭ হিজরী সনে হযরত আলী রা. রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা সমাধানে সালিসী ব্যাবস্থায় সম্মতি জ্ঞাপন করলে 'আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্হব হারামী' নামক জনৈক ব্যক্তি বলে উঠে لا حكم إلا لله -'বিধান একমাত্র আল্লাহর; মানুষের কোন সালিস সমাধান গ্রহণযোগ্য নয়।' অথচ সমাধান ইসলামী নীতিমালা সমর্থিত হলে তা অবশ্যই পালনীয়। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আলী রা. বলেছিলেন, كلمة حق أريد بها باطل (ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত ২/২৯৫)

বুলি রচয়িতারা কখনো তাদের মনের প্রচ্ছন্ন ব্যাপারটিকে খানিকটা উন্মুক্ত করেই প্রকাশ করে ফেলেন–'পশু নয় পশুত্বের কোরবানী চাই'। একসময় তারা স্থান-কালের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখে একটু লুকিয়ে-চুরিয়ে তাদের মনের বাসনাকে প্রকাশ করতেন। প্রযুক্তির অপার সম্ভাবনা আর পরিবেশের আনুকূল্যে এখন তারা আর লুকোচুরির আশ্রয় নেন না। নেট মিডিয়াতে এ ব্যাপারে তারা তাদের বাকস্বাধীনতাকে মনের সবটুকু মাধুরী মিশিয়ে প্রয়োগ করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের আর উপরস্থ বাগধারাটির দ্বারস্থ হতে হয় না। কারণ তারা এবার তাদের মনের কথা এবং কলমের কথাকে এক করে দিয়েছেন। মতলবটি যেমন কদর্য ছিল কথাটিকেও তেমন কদর্য করে দিয়েছেন। মতলবের মত কথাটিও সত্যতার আঁচড় মুক্ত। মুক্তমনের এসব মানব সন্তানেরা আদৌ ভেবে দেখেন না, তারা পশুর পরিবর্তে নিছক পশুত্বের নিধন করার নামে হাজারো পশুত্বের জন্ম দিচ্ছেন। এ নয়া পশুত্বের নিধনযজ্ঞ কি করে হবে তা কি তারা কদাচিৎ ভেবে দেখেন?

আমরা এবার কুরবানী বিষয়ক তাদের বক্তব্য নিয়ে কিছুটা পর্যালোচনার চেষ্টা করবো। জনৈক ব্লগার 'আমার ব্লগ' নামের একটি ব্লগে 'পশু কোরবানী : মুদ্রার অপর পিঠ' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লেখেন। নিবন্ধটি ক' বছরের পুরনো হলেও নেট সার্চে এখনো খুব সহজে হাতের নাগালে চলে আসে। ব্লগার মহোদয় তার নিবন্ধটি সূচনা করেছেন কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামে প্রচলিত একটি কবিতা দিয়ে। কবিতার শব্দগাঁথুনি নিম্নরূপ-

দিওনাকো পশু কোরবানী,
বিফল হবেরে সবখানি।
মনের পশুরে করো জবাই,
পশুরাও বাঁচে বাঁচে সবাই।

কবিতাটি সত্যিই কবি নজরুল ইসলামের কিনা তা নজরুল গবেষক কিংবা কাব্য-কবিতা নিয়ে যারা নিরন্তর সাধনা করেন তারা বলতে পারবেন। কবি নজরুল ইসলাম জীবনে অনেক কবিতা লিখেছেন। বিশ্বাসের নিগড়ে তার জীবনটি নানা অধ্যায়ে বিভক্ত। তিনি তার জীবনকে আলোচনা সমালোচনার নানা পর্বে বিভক্ত করে গিয়েছিলেন। তো তিনি তার জীবনের কোন পর্বে আলোচিত কবিতাটি রচনা করেছিলেন এবং এর পরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনুকূলে কোনো কবিতা রচনা করেছিলেন কিনা? উল্লেখিত কবিতাটিকে সূত্র হিসেবে উল্লেখ করার পূর্বে এ বিষয়গুলো সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা জরুরী। তাছাড়া কবি সাহেব নিছক একজন কবিই বটে। কোনো কবি যদি কখনো বিশ্বাসের নিগড়ে আবদ্ধ থাকতে না পারেন তবে তার কবিতাকে প্রমাণ-সূত্রের মানদণ্ডে উন্নীত করা যায় না। সাধারণত কবিদের কাব্যিক ভাবনায় সত্য-অসত্যের অফুরন্ত সমাবেশ ঘটে। তারা কল্পনার জগতকে শব্দবন্দি করে কবিতার রূপ দেন। যুক্তি তর্কে কিংবা অনুসন্ধানী বিবরণে কবিতা সচরাচর প্রমাণ-সূত্র হিসেবে স্থান পায় না। সুতরাং কবি নজরুল মুসলিম হতে পারেন, তার কবিতা তো ইসলাম নয়। তার কবিতাকে ইসলামী নীতি বিধানের মাপকাঠিতে যাচাই করতে হবে। এতে যতটুকু টিকবে ততটুকুই প্রমাণসূত্র হিসেবে গণ্য হবে। এরপর ব্লগার মহোদয় নিবন্ধটির ছোট্ট একটি গৌরচন্দ্রিকা টেনেছেন। গৌরচন্দ্রিকাটির শেষ প্রান্তে এসে তিনি বলেন, *একদিনে লাখ লাখ গরু হত্যা করে পৈশাচিক উল্লাস পালন করে যে মোহাবিষ্ট মুসলমানরা, আর অজুহাত দেখায় ধর্মীয় নির্দেশের, ঐশী বাণীর, এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ আর কতদিন চলবে... এমন প্রশ্ন তাড়িত করে নিশ্চয়ই প্রতিটি বিবেকবান মানুষের!!*

যে ব্লগার ভাইটি এমন জঘন্য মন্তব্য করলেন, জানি না তিনি কোনো ধর্মীয় পরিচয় বহন করেন কি না। কোরবানী বিধানটি দু শ্রেণীর মানুষের লেখনি আগ্রাসনের শিকার।

(১) আস্তিকতার সীমানা মাড়িয়ে যারা নাস্তিকতার মুক্ত (?) প্রান্তরে প্রবেশ করেছেন।

(২) মুনকিরীনে হাদীস (হাদীস অস্বীকার কারী) = মুস্তাশরিকীন (প্রাচ্যবিদ) = ওয়ারিয়েন্টালিস্ট (প্রগতিবাদী)।

ব্লগার মহোদয় যদি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকেন (নিবন্ধটির সরল পাঠে মনে হয় তিনি এ শ্রেণীভুক্ত।) তবে তো তার সাথে বিতর্কের বিষয়টি নিছক কুরবানীর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং এক ধাপ এগিয়ে হাদীসের অস্তিত্ব ও সত্যতা বিষয়েই তার সাথে বিতর্কে জড়াতে

হবে। কারণ কুরবানীর প্রামাণিকতা বিষয়ে কুরআনের মূলসূত্র বিদ্যমান থাকলেও তাতে অপব্যাখ্যা গ্রহণের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তাই বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে উদ্ভূত সে অপব্যাখ্যার অপনোদন ঘটিয়ে কুরবানী বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করতে হয়। এখন যে ব্যক্তি হাদীসের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না তার সাথে নিছক কোরবানীর অস্তিত্ব প্রমাণে বিতর্ক করার অবকাশ আপাতত নেই। দ্বিতীয়ত যারা হাদীসের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাদের সাথে বিতর্কটা কি শিরোনামে হবে? মুসলিমের সাথে মুসলিমের বিতর্ক নাকি অমুসলিমের সাথে মুসলিমের বিতর্ক? এটি একটি সমাধান সাপেক্ষ ব্যাপার। যারা কুরআনের ব্যাখ্যায় হাদীসকে অচ্ছুৎ এবং অপাংক্তেয় মনে করেন তারা কি আদৌ ঈমানের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারেন? সারকথা এ শ্রেণীর মানুষের মন্তব্যের জবাবে নাতিদীর্ঘ একটি নিবন্ধের প্রয়োজন পড়বে। যার জন্য এ সময় এবং এ স্থান উপযোগী নয়। আর যদি ব্লগার মহোদয় প্রথম শ্রেণীভুক্ত হন তবে বিতর্কটা হবে আস্তিক-নাস্তিক, মুসলিম - কাফের, মুসলিম-মুরতাদ শিরোনামে। তো যারা এ শ্রেণীভুক্ত তারা তো পূর্ণ দীনে ইসলামটিকে পূতিগন্ধময় একটি পাগাড় জ্ঞান করে থাকে। আর কুরবানী তো তার ক্ষুদ্র একটি শাখা মাত্র। সুতরাং কুরবানীর অস্তিত্ব নয় দীনের অস্তিত্ব বিষয়েই তাদের সাথে প্রাথমিক বিতর্ক হতে পারে। যা স্বতন্ত্র নিবন্ধ নয়; স্বতন্ত্র গ্রন্থ সাপেক্ষ। তবে এ আসরে এতটুকু বলা যায়, ব্লগার মহোদয় আপনি যে শ্রেণীভুক্তই হোন না কেন আপনি বা আপনার শ্রেণীভুক্তরা কিন্তু বৌদ্ধ সমাজের মত নিরামিষভোজী নন। আপনার গৃহে অতিথি এলে আপনিও মাছ, মুরগী, কবুতর জাতীয় প্রাণীর গলে ছুরি চালিয়ে দেন। তখন কিন্তু আপনার আনন্দকে শিকেয় তুলে রাখেন না। তখন কিন্তু 'জীব হত্যা মহাপাপ' শ্লোগানে আপনার কপোল বেয়ে মমতার অশ্রু ঝরে না। পশ্চিমা বিশ্বে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ শুকর হত্যা করা হচ্ছে, প্রতিটি কসাইখানায় হাজার হাজার পশু জবাই হচ্ছে। এজন্য তো আপনার মায়া কান্নায় চোখ ভেজে না। তাহলে কুরবানী নামক ইবাদত নিয়ে আপনার এতো উদ্বেগ উৎকণ্ঠার গোড়াসূত্র কী? মহোদয়! গরু হত্যা করে পৈশাচিক কেন মানবিক উল্লাসও ইসলামে কাম্য নয়। উযহিয়্যার পশুকে ভালোবাসার মাধুরী মিশিয়ে আপন হাতে প্রতিপালন করে অসীম মমতা সৃষ্টি করে তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টির সামনে নিজের মায়া-মমতাকে বিসর্জন দিয়ে অশ্রুসজল বেদনা বিধুর আবহ সৃষ্টি করাই হলো উযহিয়্যা বিধানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আর আল্লাহর বিধান সম্পন্ন করার চেয়ে মুমিনের জন্য আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে। সুতরাং উযহিয়্যার দিনে মুমিনের আনন্দ 'গোহত্যা' কেন্দ্রিক নয়; আল্লাহর বিধানকে সন্তুষ্টচিত্তে সম্পন্ন করতে সক্ষম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই এ আনন্দ উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ। এজন্য ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ– যখন কেউ তার পশুকে জবাই করে সে যেন তার ছুরি ভালোভাবে ধারিয়ে নেয়। যাতে পশুর কোন রকম বাড়তি কষ্ট না হয়। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৯৫৫) ধারহীন ভোঁতা ছুরি দিয়ে পশু জবাই নিষিদ্ধ। পশুর সামনে ছুরি ধার দেয়া নিষিদ্ধ। এক পশুর সামনে অন্য পশু জবাই করা নিষিদ্ধ। (শরহু মুসলিম ১৩/১১০) যদি কুরবানীতে পৈশাচিক উল্লাসই উদ্দেশ্য হয় তাহলে এতো এতো বিধি-নিষেধের স্বার্থকতা কী?!

কোনো বিষয়ে মন্তব্য করার পূর্বে সে বিষয় নিয়ে প্রচুর অধ্যয়ন করতে হয়। জানি না ব্লগার মহোদয় কি পরিমাণ সময় এ খাতে ব্যয় করেছেন। নাকি তিনি তার উপরস্থদের লেখালেখিতে একপেশে কিছু অধ্যয়ন করেই কর্মজগতে নেমে পড়েছেন। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় পদস্খলন থেকে নিরাপদ রাখুন। ব্লগার মহোদয় এরপর তার চিন্তাগত মুক্ত অভিমতের পক্ষে চারটি প্রমাণ-সূত্র (?) উপস্থাপন করেছেন। অবশ্য ব্লগার মহোদয় এ সূত্রগুলোকে 'ভাবনা' বলে স্বীকার করেছেন। এ ভাবনাগুলো কি বস্তুত মুক্ত মনের ভাবনা নাকি উন্মত্ত মনের ভাবনা তা উপলব্ধি করা বেশ দুরূহ। এবার তাহলে ক্রমানুসারে ভাবনাগুলোর সাক্ষাৎ লাভ করা যাক।

(১) আশিক্কীনে আউলিয়া ঐক্য পরিষদ বাংলাদেশের সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ সাদেক নূরীর অভিমত : প্রয়োজনে পশু জবাই করা, এর গোশত খাওয়া খাওয়ানো বৈধ; কিন্তু কোনো বিশেষ দিনে যত্রতত্র ও যথেচ্ছা পশু জবাই করে গোশত খাওয়া উৎসবকে কোরবানি আখ্যা দেয়া কোরআন সম্মত নয়। বস্তুতঃ কোরবানি শব্দের সাথে ঈদ শব্দের বন্ধন অর্থাৎ কোরবানির ঈদ তথা পশু জবাইর আনন্দ বাকধারার প্রচলন কোরবানির উপরে বর্ণিত কোরানিক ধারণা ও শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেছে। কারণ, তর্কের খাতিরে, কোরবানির তুচ্ছতম প্রতীক হিসাবে প্রচলিত পশু জবাইকে আল্লাহর প্রেমে হযরত ইব্রাহীমের সন্তান জবাই করার আর সন্তানের জবাই হওয়ার বিকল্প (?) যদি মেনেও নেয়া হয়, অপরদিকে ঈদ সর্বসম্মত অর্থে আনন্দ; তা হলেও কোরবানির ঈদ অর্থ দাঁড়ায় পশু জবাইয়ের আনন্দ। বলা বাহুল্য যে, প্রয়োজনে পশু জবাই বৈধ হলেও আনন্দের জন্য পশু জবাই করা অথবা আনন্দ করে পশু জবাই করা অথবা পশু জবাইর আনন্দ কোরআন তো নয়ই, কোন সুস্থ বিবেকের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। ...মালয়েশিয়াতে মালদারগণ জীবনে একবার হজ্জ করেন এবং একবারই আলোচ্য সামাজিক যৌথ অনুষ্ঠানে পশু জবাইতে অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে ব্রুনাইর বাদশাহ ঐ বিশেষ দিনে সকলের পক্ষ থেকে একটি পশু জবাই দিয়ে থাকেন। আসলে যৌথ সামাজিক আনন্দ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পশু জবাই করার ঐচ্ছিক বিষয়টি এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে, এটাকে কোন মতেই কোরবান বলা সংগত নয়।

মাওলানা সাহেব তার দীর্ঘ মন্তব্যে একবারের জন্যেও হাদীস শব্দটি উল্লেখ করলেন না। তবে কি তিনি প্রাচ্যবিদদের অনুগামী? নাকি তিনি নিছক আশিকে আউলিয়া? আশিকে নবী নন? নতুবা তো নবীর হাদীসের ব্যাপারে এমন বিমাতাসুলভ আচরণ হওয়ার কথা নয়। আপনি একজন মাওলানা সাহেব। যে ধারারই হোক আপনি মাদরাসায় কিছু সময় লেখাপড়া করেছেন। আপনার শিক্ষাকালীন মাদরাসার শিক্ষা কারিকুলামে কুতুবে সিত্তাহ তথা হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থষষ্ঠক অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেসব গ্রন্থগুলোর পাঠ নিশ্চয় আপনি গ্রহণ করেছেন। তো সেসব গ্রন্থে কি কুরবানী বিষয়ক কোনো বাণী বা আলোচনা স্থান পায়নি? তো কেমন করে আপনার ক্ষেত্রে এমন কিম্ভূৎকিমাকার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো? মাওলানা সাহেব বললেন, পশু জবাই করে গোশত খাওয়া উৎসবকে কোরবানী আখ্যা দেয়া কোরআন সম্মত নয়। আমরা এ কথা বলি যে, গোশত খাওয়ার উৎসবকে কুরবানী আখ্যা দেয়া কুরআন কেন ইসলাম সম্মতও নয়। ইসলামী পরিভাষায় গোশত খাওয়ার উৎসব কুরবানী নয়; কুরবানী হল নিজের হাতে পালিত প্রিয় প্রাণীকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নির্দেশের সামনে সঁপে দেয়া। সুতরাং এ আনন্দ পশু হত্যার কিংবা গোশত খাওয়ার আনন্দ নয়; বরং ইবাদত পরিপালনের আনন্দ। উপরন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ

দিবসগুলোকে ঈদুল আযহা তথা ত্যাগ বা উৎসর্গের আনন্দ বা উৎসব বলে অভিহিত করেছেন। কুরবানীর ঈদ বা পশু জবাইয়ের আনন্দ বাগধারার প্রচলন যদি কুরবানী বিষয়ক কুরআনিক ধারণা বা শিক্ষাকে ম্লান বা বিনষ্ট করে দেয় তবে সে দায়ভার (আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি) তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বর্তায়! তিনিই তো এ দিবসকে ঈদুল আযহা বলে অভিহিত করে গেছেন। মাওলানা সাহেব বলেছেন, ...মালয়েশিয়াতে মালদারগণ জীবনে একবার হজ্জ করেন এবং একবারই আলোচ্য সামাজিক যৌথ অনুষ্ঠানে পশু জবাইতে অংশগ্রহণ করেন।

মাওলানা সাহেব মালয়েশিয়া ও ব্রুনাইয়ের কুরবানী পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। সেখানের সামগ্রিক বাস্তবতার বিশ্লেষণে আমরা না-ই গেলাম। কিন্তু সারা দুনিয়ার এতো এতো কুরবানী পদ্ধতির মধ্যে এ দু'টি পদ্ধতি মাওলানার পছন্দ তালিকায় ঠাঁই পেল কোন গুহা-রহস্যের ভিত্তিতে! তার বক্তব্য 'কুরবানীর নামে পশু জবাইয়ের আনন্দ কুরআন তো নয়ই কোন সুস্থ বিবেকের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়' এর দাবী তো এটাই যে, পশু একটা জবাই করা হোক কিংবা একবার; আনন্দের জন্য পশু জবাই করা হলে সুস্থ বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাহলে উপরোক্ত দুই দেশের কুরবানী পদ্ধতি পছন্দ হল কেন? তবে কী মাওলানার সুস্থ বিবেক আচমকা অসুস্থ হয়ে গেল। ফলে এই পদ্ধতিতে আনন্দ গ্রহণযোগ্য হয়ে গেল! নাকি বিভ্রান্তির বেড়াজালে মোচড়ামোচড়ি করতে করতে হঠাৎ তিনি পাগলই হয়ে গেলেন!! নামের শুরুতে সুন্দর বিশেষণ মাওলানা লাগিয়েছেন। মাওলানা হতে হলে যে অল্প-বিস্তর হাদীসও জানতে হয় মাওলানা সাহেব সম্ভবত এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন। তাই কুরআনের দাবী ব্যাখ্যা করে সরাসরি মালয়েশিয়া আর ব্রুনাই চলে এলেন। মাওলানা সাহেব হাদীসের নিম্নোক্ত বক্তব্য 'যে কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানীর হুকুম পালন করল না সে যাতে ঈদগাহের ধারে কাছেও না আসে' (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৮২৭৩) এর আশপাশ দিয়ে ঘোরাঘুরির সুযোগ পর্যন্ত পেলেন না।

এরপর ব্লগার মহোদয় বিতর্কিত আরেকজন মানুষের কুরবানী বিষয়ক একটি বিবরণী তুলে ধরেছেন। বিবরণটি নিম্নরূপ-

(২) নয়া কৃষি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ফরহাদ মজহার বলেছেন : ... প্রাণী হত্যা দেখানো হয়েছে ধর্মের নামে। ইসলামের নামে। এই প্রাণী হত্যার মাধ্যমে এটাই প্রমাণ করা হয়েছে যে, ঠাণ্ডা মাথায় একটি প্রাণী জবাই করাই ইসলামের শিক্ষা। শুধু খেয়াল রাখতে হবে খুন হয়ে যাওয়া প্রাণীটির রক্ত যেন ধুয়ে গর্তে ফেলা হয় এবং ছালের ভাল দাম পাওয়ার জন্য প্রাণীটিকে পানি খাইয়ে ঠিক মতো ছাল ছিলে নেওয়া হয়। একবারও কেউ ব্যাখ্যা করে বলেনি যে, কোরবানি ও প্রাণী হত্যা এক কথা নয়। আল্লা মানুষ যেমন পয়দা করেছেন, পশুকেও পয়দা করেছেন। ইসলামের যে আল্লাকে জানি তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবকে এইভাবে জবাই হতে দেখবেন এটা আমি বিশ্বাস করি না। কণ্ঠনালী ফেঁড়ে যাওয়া প্রাণীর কষ্টে তাঁর আরশ কেঁপে ওঠার কথা। কিন্তু এই আল্লার নামেই জবাই করা হয় এবং এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ী এই হত্যাকেই কোরবানি আখ্যা দেয়। এদের যদি প্রশ্ন করা হয়, জবাই করা আর কোরবানির মধ্যে তফাৎ কি? তার কেউই উত্তর দিতে পারবে না। (উৎস : দৈনিক ভোরের কাগজ, ৩০-১০-৯৪)

ফরহাদ মজহার বামধারার একজন কলামিষ্ট। আর বামধারার দর্শন হলো কমিউনিজম। কমিউনিজমের প্রধান গুরু কার্লমার্কস বলেছেন, 'পৃথিবী বস্তুর নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এজন্য কোনও সার্বজনীন সত্তা বা খোদার প্রয়োজন নেই।' কমিউনিজমের দ্বিতীয় গুরু লেনিন বলেন, 'নাস্তিকতা মার্কসবাদের স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য অঙ্গ। নাস্তিকতা ছাড়া মার্কসবাদ কিছুতেই বোঝা যেতে পারে না।' তিনি আরো বলেন, 'মার্কসবাদী হতে হলে তাকে জড়বাদী হতেই হবে, অর্থাৎ তাকে হতে হবে ধর্মের শত্রু।'– মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন, ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ ৬১৬।) সুতরাং কমিউনিজমে যারা আস্থাশীল ধর্ম বিশেষত ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস বা মন্তব্য কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। মজহার সাহেবদের জ্ঞাতার্থে বলছি, ঠাণ্ডা মাথায় শুধু প্রাণী হত্যা কেন ক্ষেত্র বিশেষে ইসলামী বিধান মতে মানব হত্যাও আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। জিহাদ, কিসাস প্রভৃতি পবিত্র অঙ্গনে মানব হত্যা তখন আর নিছক মানব হত্যা থাকে না পবিত্র ইবাদত-উপাসনার রূপ পরিগ্রহ করে। আর মজহার সাহেবরা যে ধারার রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন সেখানে রাজনীতির চূড়ান্ত ফল পেতে অন্যায়ভাবে মানব হত্যাকে অন্যতম অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তখন তাদের নিকট এসব রাজনৈতিক হত্যালীলা বৈধতার স্বীকৃতি পেয়ে যায়। মজহার সাহেবের উপস্থাপনাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে হয় তিনি মশা-মাছির গায়েও টোকা মারেন না। ব্যক্তি জীবনে কি তিনি প্রাণীর প্রতি এমন মমতাবোধকে সদা জাগ্রত রাখতে সক্ষম হন? তিনি কি শাক সবজি আহার করেই জীবনের পড়ন্ত বিকালের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন? বিজ্ঞান বলে উদ্ভিদেরও নাকি প্রাণ আছে। তবে তো মজহার সাহেবদের জল পান করেই জীবনের ইতি টানতে হবে। এর বিপরীত পথে চললে তো প্রাণীকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা ছাড়া কোনো উপায়ন্তর থাকবে না।

ব্লগার মহোদয় তথ্যসূত্রের তৃতীয় ধাপে এসে স্বশিক্ষিত একজন মাতুব্বর সাহেবের কিম্ভূতকিমাকার একটি উদ্ধৃতি এনেছেন। উদ্ধিতিটি পাঠ করুন।

(৩) আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর সত্যের সন্ধানে গ্রন্থের জীবহত্যায় পুণ্য কি প্রবন্ধে বলেছেন : কোরবানি প্রথার মূল উৎস সন্ধান করিলে মনে কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হয়। প্রশ্নগুলো এমন-- (ক) হযরত ইব্রাহীম এর স্বপ্নাদেশ তাঁহার মনের ভগবদ্ভক্তির প্রবণতার ফল হইতে পারে না কি? (খ) খোদাতালা নাকি স্বপ্নে বলিয়াছেন, হে ইব্রাহীম, তুমি তোমার প্রিয়বস্তু কোরবানি কর। এই প্রিয়বস্তু কথাটির অর্থ হযরত ইব্রাহীম তাঁহার পুত্র ইসমাইলকে বুঝিয়াছিলেন এবং তাই তাহাকে কোরবানি করিয়াছিলেন। হযরত ইব্রাহীমের প্রিয়বস্তু তাঁহার পুত্র ইসমাইল না হইয়া তাঁহার প্রাণ হইতে পারে না কি? ... (গ) কোরবানি কথাটির অর্থ বলিদান না হইয়া উৎসর্গ হইতে পারে কিনা। ঈসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্তান উৎসর্গের নিয়ম আছে। কোন সন্তানকে তাহার পিতামাতা মহাপ্রভুর নামে উৎসর্গ করিতে পারেন। ঐরূপ উৎসর্গ করা সন্তানের কর্তব্য হয়- সর্বস্বত্যাগী হইয়া আজীবন ধর্মকর্ম ও মন্দির-মসজিদের সেবা করা।... (ঘ) যাঁহারা স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন যে, স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে যাহা কিছু দেখে তাহার মধ্যে অধিকাংশই থাকে রূপক। হযরত ইব্রাহীমের স্বপ্নের কোরবানির দৃশ্যটি রূপক হইতে পারে কিনা? উপরিউক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, কোরবানির প্রথার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় নয়। একটি স্বপ্নের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ পশুর জীবন নষ্ট হইতেছে। উপন্যাসকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিলে যেরূপ ভুল করা হয়, স্বপ্নের রূপককে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিলে সেইরূপ ভুল হইতে পারে না কি?

আরজ আলী মাতুব্বর সাহেব স্বশিক্ষিত একজন ভূমি বিশেষজ্ঞ। তিনি বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাস করতেন। বস্তুবাদ আর ধর্মবাদ হলো নেগেটিভ পজিটিভ ব্যাপার। একজন ধার্মিক আদৌ বস্তুবাদী হতে পারে না। অন্যদিকে একজন বস্তুবাদী আদৌ ধর্মবাদী হতে পারে না। তো একজন বস্তুবাদী মাতুব্বর সাহেবের কলম থেকে ধর্মীয়মূল্যবোধ আদৌ আশা করা যায় না। মাতুব্বর সাহেব এক ধাপ এগিয়ে শেখর থেকে শিকড়ে গিয়ে আঘাত হেনেছেন। ইসলামী স্বীকৃত নীতি হলো, কুরআনের ব্যাখ্যায় মতবৈচিত্রের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু এর মূলপাঠে কারো প্রশ্ন বা দ্বিধা সংশয় থাকলে তার নামটি আর মুসলিম তালিকায় বিদ্যমান থাকে না। মাতুব্বর সাহেবের প্রশ্নগুলো বস্তুত তার স্বশিক্ষার পরিণত ফল। প্রথমত মাতুব্বর সাহেবের মনে প্রশ্ন উদয় হয়েছে, ইবরাহীম আ. এর প্রতি স্বপ্নাদেশ কি তার মনের ভগবদ্ভক্তির প্রবণতার ফল হতে পারে কি না? অথচ নবী হওয়ার প্রধান এবং অত্যাবশ্যক শর্ত হলো, ভগবদ্ভক্তি তথা প্রভুভক্তি। প্রভুভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের পরেই আসে নবুওয়াতের সুমহান গুরুভার দায়িত্ব। আর সহীহ বুখারীর বিবরণ মতে নবীদের স্বপ্ন তো নিছক স্বপ্নাদেশ নয়; বরং তা প্রত্যাদেশ। সুতরাং ইবরাহীম আ. এর স্বপ্নাদেশ তাঁর প্রভুতপস্যার আবশ্যিক ফল ছিল এতে সংশয় সন্দেহের ন্যূনতম অবকাশ নেই। মাতুব্বর সাহেব দ্বিতীয় ধাপে ইবরাহীম আ. এর স্বপ্নের অস্তিত্বের উপরই প্রশ্নাগ্রাসন চালিয়ে দিয়েছেন। সাথে ইবরাহীম আ. এর স্বপ্নের প্রিয় বস্তুটি তার সন্তান কি না এ ব্যাপারেও তার পর্বত প্রমাণ সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। অথচ বিষয় দুটি ব্যাখ্যায় নয়; কুরআনের মূলপাঠেই উপস্থিত রয়েছে। আল্লাহর বাণীতেই যার অবিশ্বাসের প্রশ্ন জাগে তাকে উত্তর দেয়ার মত তো কিছু থাকে না। তৃতীয় ধাপে এসে মাতুব্বর সাহেব কুরবানীর মূলানুগ অর্থ পরিত্যাগ করে রূপক অর্থ গ্রহণ করতে চাইছেন। মাতুব্বর সাহেবের এ দর্শনই কবি নজরুলের উক্ত কবিতা ও অন্যান্য বুলিতে নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে। মাতুব্বর সাহেব এ দর্শনটিকে শক্তিময় করে তোলার জন্য খৃস্টান সমাজের ধর্মনীতিকে মডেল হিসেবে টেনে এনেছেন। সর্বশেষে মাতুব্বর সাহেব একজন নবীর স্বপ্নকালীন প্রত্যাদেশে কাল্পনিক চরিত্রের কালিমা এঁকে দিতে নিরত হয়েছেন। মাতুব্বর সাহেব বুঝাতে চাচ্ছেন, নিছক একটি স্বপ্নীল কল্পনাকে বাস্তবতার রূপ দিয়ে ধর্মতাত্ত্বিকগণ যুগযুগ ধরে ভুলের ইতিহাস রচনা করছেন। উন্মাদনারও শ্রেণীভাগ রয়েছে। মাতুব্বর সাহেবের এ অদ্ভুত দর্শন কোন শ্রেণীতে ভুক্ত হবে তাই বিবেচ্য বিষয়। মাকাল বৃক্ষে যেমন মিষ্ট ফলের আশা করা যায় না তেমনি মাতুব্বর সাহেবের বস্তুবাদী দর্শন থেকে ধর্মের সত্যতা আশা করা যেতে পারে না।

ব্লগার মহোদয় চতুর্থ ধাপে এসে আরেক জন গবেষকের (?) একটি বিবরণ এনেছেন। বিবরণটি নিম্নরূপ-

...কোরবানি যাতে আইয়ামে জাহেলিয়াতের মতো পশু নিধন অনুষ্ঠানের মহোৎসবে পরিণত না হয় এমন আশঙ্কা থেকেই সম্ভবত হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.) বা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতো সাহাবীগণ কখনো পশু কোরবানি দিতেন না। (দ্রষ্টব্য : ইমাম সাফি, কিতাব-উল-উম্মা, ভল্যুম-২, পৃষ্ঠা ১৭৯)। সেসময় সাধারণত একটি গোত্রের সকল মানুষের পক্ষ থেকে একটি মাত্র পশু কোরবানি দেয়া হত। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও পুরো বনী হাসেম গোত্রের পক্ষ থেকে একটি পশু কোরবানি দিতেন। (দ্রষ্টব্য : নাহেল আল-আউতার, ভল্যুম-৫, পৃষ্ঠা ১৭৭)। দোহাই : বেনজীন খান সম্পাদিত পশু কোরবানি : একটি বিকল্প প্রস্তাব (সংস্কার আন্দোলন, ১ম সংস্করণ, প্রকাশ ২০০৫)।

গবেষক মহোদয় যে বর্ণনাটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন সে বর্ণনাটিতে স্পষ্টভাবেই উল্লেখিত হয়েছে, মানুষ আবশ্যক জ্ঞান করে বসবে এ শঙ্কায় আবু বকর এবং উমর রা. কুরবানী করতেন না।–ইমাম নববী, শারহুল মুহাযযাব ৯/৩৭৬, সুনানে বাইহাকী কুবরা, হাদীস ১৯৫০৭। তো হাদীসটির মধ্যে স্পষ্ট করে তাঁদের আশঙ্কার কথাটি ব্যক্ত হয়েছে। তো গবেষক মহোদয় কোন উদ্দেশ্যে নতুন আশঙ্কার মহোৎসবে মেতে উঠলেন। কোনো বিষয়ে মন্তব্য করার পূর্বে বিষয়টির সবগুলো সূত্রপাঠ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে হয়। এরপর মন্তব্য করার মত ঝুঁকিপূর্ণ ময়দানে অবতরণ করতে হয়। হাদীসটির অন্য সূত্রে একই বর্ণনাকারী সাহাবী হুযাইফা ইবনে আসীদ রা. বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْر وعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ومَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا

অর্থ, আমি আবু বকর এবং উমর রা. কে দেখেছি, তাঁরা তাঁদের অনুকরণ করা হবে এ আশঙ্কায় নিজেদের পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন না। সুনানে বাইহাকী কুবরা, হাদীস ১৯৫০৮। হাদীসটিতে প্রচ্ছন্নতা নেই। তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, তারা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন না। তারা নিজেরা নিজেদের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন না এমন কথা হাদীসটিতে নেই। এরপর গবেষক মহোদয় মুহাম্মদ ইবনে আলী শাউকানী রাহ. এর নাইলুল আউতার গ্রন্থ থেকে দুটি উদ্ধৃতি টেনেছেন। উদ্ধৃতি দুটি যেভাবে গবেষক মহোদয় নিজস্ব সরল ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন ওভাবে মূল গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নি। গবেষক মহোদয় সংশ্লিষ্ট আলোচনার খণ্ডিত অংশ নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এতে বিভ্রান্তির যথেষ্ট উপাদান রয়ে গেছে। বস্তুত গবেষক মহোদয় যে বিষয়ে কলম ধরেছেন বিষয়টি ফিকহ ও হাদীসের শাস্ত্রীয় আলোচনা সাপেক্ষ। সে আলোচনা গবেষক মহোদয়ের জন্য উপযোগী কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে তার লেখার উপস্থাপনা দৃষ্টে মনে হয় না তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মোটামোটি পর্যায়ের ধারণা রাখেন। তার উদ্ধৃত গ্রন্থের নামটি দেখেও তা কিছুটা অনুমান করা যায়। তিনি লিখেছেন 'নাহেল আল - আউতার'। এ নামে কোনো গ্রন্থ আছে বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুত আলোচ্য গ্রন্থটির নাম হলো 'নাইলুল আউতার' যা পেছনেও উল্লেখ করেছি।

সফিউদ্দিন আহমাদ নামের আরেকজন ব্লগার মহোদয়ও 'কোরবানি ও আমাদের ধর্মপালন' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেন। তাতেও তিনি উপরোক্ত ব্লগার মহোদয়ের ন্যায় এ ধরনের অদ্ভুতুড়ে উদ্ধৃতির সমাহার ঘটিয়েছেন। তবে তিনি বাড়তি একটি উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে বলেন, 'স্যার সৈয়দ আলীগড় ক্যাম্পাসে ঈদুল আজহায় পশু কোরবানি নিষিদ্ধ করেছিলেন।'

স্যার সৈয়দ আহমদ তো একজন ন্যাচারাল ম্যান। তার জন্য কুরবানী নিষিদ্ধ করা তো নিতান্তই সাহজিক এবং তুচ্ছ একটি ব্যাপার। কারণ তিনি মালাইকা (ফেরেশতা), শয়তান, কবর জগতের শাস্তি, কিয়ামত, পুনরুত্থান, হুর-গিলমান, ভাগ্যলিপিসহ ইসলামী শরীয়তের অসংখ্য স্বতঃসিদ্ধ এবং অকাট্য বিষয়গুলোকে আয়েশী ভঙ্গিতে অস্বীকার করতেন। তার অবস্থানকে তিনি নিজেই পরিষ্কার করে গেছেন। সুতরাং এমন একজন স্বঘোষিত ব্যক্তির উদ্ধৃতিতে কুরবানীর মত ওয়াজিব বিধান তো নিষিদ্ধ হবেই! আল্লাহ আমাদেরকে দীন হীনতার যাবতীয় বিষবাষ্প থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন!

বদলী হজ্জের বিধি-বিধান

মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.

যার ওপর হজ্জ ফরয হয়েছে এবং সে হজ্জের মৌসুমও পেয়েছে কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোন কারণে হজ্জ আদায় করেনি, তারপর একসময় সে হজ্জ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে– তো এমন ব্যক্তির ওপর ফরয হল, সে নিজেই কাউকে পাঠিয়ে বদলী হজ্জ করাবে অথবা তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করানোর ওসিয়ত করে যাবে।

হজ্জ করার প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি অর্জনের পর কেউ যদি হজ্জের মৌসুম আসার আগেই মারা যায় তাহলে তার যিম্মা থেকে হজ্জের দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। সুতরাং তার জন্য আর বদলী হজ্জ করানোর ওসিয়ত করে যাওয়া জরুরী নয়।

হজ্জ করতে অক্ষম প্রমাণিত হওয়ার শর্তাবলী

হজ্জ করতে অক্ষম হওয়ার একটি অবস্থা তো উল্লেখ করা হল যে, হজ্জের সময় আসার আগেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে তার ওপর আর হজ্জ ফরযই থাকে না। অক্ষম হওয়ার দ্বিতীয় অবস্থা হল, কেউ তাকে গ্রেফতার করে ফেলল বা জোরপূর্বক মক্কা শরীফ যেতে দিল না। তৃতীয় অবস্থা হল, সে এমন অসুখে পড়ল যে, সুস্থতার আর আশা নেই। উদাহরণত কেউ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হল, অথবা দৃষ্টিহীন কিংবা ল্যাংড়া হয়ে গেল। অথবা বার্ধক্যজনিত এমন দুর্বলতার শিকার হল যে, একা একা যানবাহনে আরোহন করতে পারে না। চতুর্থ অবস্থা হল, যাতায়াতের পথ অনিরাপদ হয়ে পড়ায় জান-মালের আশঙ্কা সৃষ্টি হল। পঞ্চম অবস্থা হল, কোন মহিলার মাহরাম সফরসঙ্গীর ব্যবস্থা হল না। এই সকল অবস্থায় এ ব্যক্তি হজ্জ করতে অক্ষম প্রমাণিত হবে। তবে শর্ত হল, এসব সমস্যা একাধারে মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকতে হবে। যদি এ সকল সমস্যা মৃত্যুর পূর্বে দূরীভূত হয়ে যায় কিন্তু অতঃপর হজ্জের মৌসুম আসা সত্ত্বেও হজ্জ করার সুযোগ না হয় তাহলে বদলী হজ্জ করানো অথবা এর জন্য ওসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। আর যদি মৃত্যু পর্যন্ত এ সকল সমস্যা বহাল থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী বদলী হজ্জের ওসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব নয়। তবে শর্ত হল, সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে হজ্জের মৌসুম না পেতে হবে। কেননা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নিকট হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য অন্যান্য শর্তের সাথে সুস্থ অবস্থায়/সমস্যামুক্ত অবস্থায় হজ্জের মৌসুম পাওয়াও একটি শর্ত। এই শর্তটি না পাওয়ার কারণেই ফরয দায়িত্ব রহিত হয়ে গেছে। ফলে ওসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব নয়। আর সাহেবাইনের মতে, আর্থিক সঙ্গতিই শুধু এমন শর্ত যে, তা না থাকলে কিংবা হজ্জের দিনগুলো আগমনের পূর্বেই তা শেষ হয়ে গেলে ফরয হজ্জের দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। আর অন্যান্য শর্তাবলী হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য নয় বরং হজ্জ আদায়ের জন্য। এসব শর্ত না পাওয়া গেলে ফরয হজ্জ রহিত হয় না। কিন্তু যেহেতু নিজে তা আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে না, এজন্য শুধু নিজে আদায়ের দায়িত্ব রহিত হয় তবে তার দায়িত্বে বদলী হজ্জের ওসিয়ত করা ওয়াজিব। মুহাক্কিক ইবনে হুমাম প্রমুখ সাহেবাইনের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এজন্য সতর্কতার দাবী হল, উক্ত সকল অবস্থাতেই বদলী হজ্জের ওসিয়ত করে যাওয়া এবং ওয়ারিশগণ কর্তৃক কাউকে দিয়ে বদলী হজ্জ করিয়ে দেয়া।

বদলী হজ্জের শর্তাবলী

যার যিম্মায় হজ্জ ফরয হয়েছে কিংবা মান্নতের মাধ্যমে যে ব্যক্তি নিজের ওপর হজ্জ অথবা উমরা ওয়াজিব করে নিয়েছে অতঃপর নিজে তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে– যার বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে– এমন ব্যক্তির হজ্জ অথবা উমরা অন্য কারো দ্বারা বদলী হিসেবে করানোর জন্য বিশটি শর্ত রয়েছে।

প্রথম শর্ত : যার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করা হচ্ছে বদলী হজ্জ করানোর সময় তার উপর হজ্জ ফরয হওয়া। যদি সে সময় পর্যন্ত তার উপর হজ্জ ফরয না হয়ে থাকে, তথাপি সে বদলী হজ্জ করায় তাহলে তা নফল হজ্জ হিসেবে গণ্য হবে। অতঃপর যদি তার হজ্জ করার সামর্থ্য হয় তাহলে তার উপর হজ্জ ফরয হবে এবং পুনরায় তাকে স্বয়ং হজ্জ করতে হবে, আর নিজে না পারলে পুনরায় বদলী হজ্জ করাতে হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্ত : বদলী হজ্জ করানোর পূর্বেই হজ্জ করতে অক্ষম হয়ে পড়া এবং অক্ষমতা স্থায়ী হওয়া। অর্থাৎ যে সকল সমস্যার কারণে মানুষ হজ্জ করতে অক্ষম সাব্যস্ত হয়– যার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে– এ সকল সমস্যা মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকা এবং বদলী হজ্জ করানোর পূর্ব হতেই তা বিদ্যমান থাকা। সুতরাং যদি কোন অক্ষম ব্যক্তি বদলী হজ্জ করানোর পর তার সমস্যা কেটে যায় এবং হজ্জ করতে সক্ষমতা অর্জন করে– উদাহরণত অসুস্থ ছিল অতঃপর বদলী হজ্জ করানোর পর সুস্থ হয়ে গেল, অথবা মহিলা তার সঙ্গে সফর করার মাহরাম পেয়ে গেল– তাহলে পুনরায় নিজে হজ্জ করা জরুরী হবে। এমতাবস্থায় পূর্বে করানো হজ্জটি নফল হয়ে যাবে।

চতুর্থ শর্ত : যার ফরয হজ্জটি আদায় করা হবে তার পক্ষ হতে বদলী হজ্জকারীকে আদেশ বা অনুরোধ করতে হবে কিংবা নিদেনপক্ষে অনুমতি দেয়া হবে। যদি তার আদেশ বা অনুমতি ছাড়াই কোন ব্যক্তি তার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করে দেয় তাহলে এই হজ্জের দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির ফরয হজ্জ আদায় হবে না।

কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. একটি হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার মরহুম পিতা-মাতার পক্ষ হতে অথবা অন্য কোন ওয়ারিশ কিংবা কোন ব্যক্তি তার ঘনিষ্ঠ কোন মরহুম বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ হতে তার আদেশ ও ওসিয়ত ব্যতিরেকেই বদলী হজ্জ করে দেয় তাহলে ইনশাআল্লাহ মরহুম ব্যক্তি ফরয হজ্জের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ যদি চান) কথাটি এজন্য বলেছেন যে, কুরআন-সুন্নাহর কোন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা এটা আদায় হওয়া সরাসরি প্রমাণিত নয়।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শর্ত : বদলী হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি মুসলমান হওয়া, বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া, পাগল না হওয়া, নাবালেগ হলে বোধজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া অর্থাৎ হজ্জ আদায় এবং সফরের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বুঝমান হওয়া।

বোঝা গেল, হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তি বালেগ হওয়া আবশ্যক নয়। নাবালেগও বদলী হজ্জ করতে পারে। তবে শর্ত হল, তার মধ্যে অন্তত হজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন করার যোগ্যতা ও সক্ষমতা থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। তবে কোন কোন আলেম

নাবালেগের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এজন্য নাবালেগ দ্বারা বদলী হজ্জ না করানো উচিত।

অষ্টম শর্ত : বদলী হজ্জের পারিশ্রমিক ও বিনিময় নেয়া যাবে না। যদি কেউ পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে কাউকে দিয়ে বদলী হজ্জ করায় তাহলে প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়েই গুনাহগার হবে। তবে হজ্জটি প্রেরণকারীর পক্ষ হতেই আদায় হয়ে যাবে। আর হজ্জকারীর দায়িত্বে গৃহিত বিনিময় ফেরত দেয়া ওয়াজিব হবে। অবশ্য প্রেরণকারী তাকে হজ্জ সংক্রান্ত সাধারণ খরচাদি প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

নবম ও দশম শর্ত : যার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করা হচ্ছে তার সম্পদ হতে হজ্জের ব্যয় নির্বাহ করা এবং যানবাহনের মাধ্যমে সফর করা, পায়ে হেঁটে না করা। যদি বদলী হজ্জকারী নিজ সম্পদ ব্যয় করে কারও পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করে তাহলে এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির ফরয হজ্জ আদায় হবে না। ব্যয়ভার নির্বাহের অর্থ হল, হজ্জের অধিকাংশ ব্যয়ভার হজ্জ করানেওয়ালার পক্ষ হতে হওয়া। তবে বদলী হজ্জকারী নিজ অর্থ হতে অল্প-স্বল্প খরচ করলে তাতে প্রেরকের হজ্জের কোন অসুবিধা হবে না। অনুরূপভাবে হজ্জকারী পদব্রজে সফর করলেও হজ্জ করানেওয়ালার ফরয হজ্জ আদায় হবে না। হজ্জের সফর যানবাহনে করার অর্থ হল অধিকাংশ সফর যানবাহনে করা। অর্থাৎ সফরের কিছু অংশ পদব্রজে করলে কোন অসুবিধা হবে না।

এগারোতম শর্ত : হজ্জ করানেওয়ালার আবাসভূমি হতে হজ্জের সফর শুরু করা। যদি ঐ ব্যক্তির কয়েকটি আবাসভূমি থাকে তাহলে সফর শুরু করার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে মক্কার নিকটবর্তী আবাসভূমিটি ধর্তব্য হবে। উদাহরণত কোন ব্যক্তি হিন্দুস্তানে ইন্তেকাল করল এবং বদলী হজ্জের ওসিয়ত করে গেল। পরবর্তীতে তার পরিবারবর্গ কিংবা যাকে দিয়ে বদলী হজ্জ করানোর ওসিয়ত করে গিয়েছিল সে বা তারা দেশত্যাগ করে পাকিস্তান চলে আসল, তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্তব্য হল, ওসিয়তকারীর বদলী হজ্জটি হিন্দুস্তান থেকে করানোর ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ হিন্দুস্তান থেকেই কোন ব্যক্তিকে বদলী হজ্জের জন্য পাঠিয়ে দেয়া। কিন্তু কোন কারণে যদি হিন্দুস্তান থেকে কাউকে পাঠাতে সক্ষম না হয়– চাই সেটা ওদেশে টাকা পাঠানো সম্ভব না হওয়ার কারণে হোক কিংবা কোন ব্যক্তিকে না পাওয়া যাওয়ার কারণে হোক– তাহলে পাকিস্তান থেকেই কাউকে বদলী হজ্জের জন্য পাঠিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ ওসিয়তকারীর ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। এ মাসআলাটি যদিও ফিকহের কিতাবে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই কিন্তু এর একটি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। যথা: মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ যদি তার আবাসভূমি থেকে হজ্জ করানোর জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে যে স্থান থেকে যথেষ্ট হয় সেখান থেকেই হজ্জ করিয়ে দেয়ার অনুমতি আছে। তো আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও দেখা যাচ্ছে, মৃত ব্যক্তির আবাসভূমি থেকে হজ্জ করানোর সক্ষমতা বিদ্যমান নেই। সুতরাং যেখান থেকে হজ্জ করানোর সক্ষমতা অর্জিত হবে সেখান থেকেই হজ্জ করিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ তা দায়মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে।

বারোতম শর্ত : বদলী হজ্জকারী ইহরাম বাঁধার সময় হজ্জের নিয়তটি যিনি হজ্জ করাচ্ছেন তার পক্ষ হতে করবে। ইহরামের সময় নিয়ত না করে থাকলে কিংবা কার পক্ষ হতে হজ্জ করা হচ্ছে তা খেয়াল না করে সাধারণভাবে হজ্জের নিয়ত করলে হজ্জের কার্যাবলী শুরু করার পূর্বে অবশ্যই নির্দিষ্ট করে হজ্জ করানেওয়ালার পক্ষ হতে বদলী হজ্জের নিয়ত করে নিতে হবে।

তেরো ও চৌদ্দতম শর্ত : যাকে বদলী হজ্জ করার জন্য বলা হয়েছে আদেশদাতার পক্ষ হতে স্বয়ং তাকেই হজ্জ করা। আদেশদাতার অনুমতি ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা বদলী হজ্জ করানো জায়েয নেই। অনুমতি ব্যতীত অন্য কারও দ্বারা করানো হলে তা আদেশদাতার পক্ষ হতে আদায় না হয়ে নির্দেশিত ব্যক্তির পক্ষ হতে আদায় হবে এবং নির্দেশিত ব্যক্তিকে আদেশদাতার অর্থ ফেরত দিতে হবে। এ জন্য উত্তম হল, নির্দেশদাতাকে নিঃশর্ত অনুমতি দিয়ে দেয়া যাতে কোন কারণে সে নিজে যেতে না পারলে অন্য কাউকে পাঠাতে পারে। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তি যদি এমনভাবে নির্দিষ্ট কারও দ্বারা বদলী হজ্জ করানোর ওসিয়ত করে যায় যে, সে ছাড়া অন্য কেউ যেন তার বদলী হজ্জ না করে, তাহলে অন্য কারও দ্বারা তার হজ্জ করানো জায়েয নেই। পক্ষান্তরে যদি কাউকে নির্দিষ্ট করে যায় পাশাপাশি অন্যদের ব্যাপারেও মানা না করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে উত্তম তো হল নির্দিষ্ট ব্যক্তি দ্বারাই হজ্জ করানো, তবে সে যদি হজ্জ করতে অস্বীকার করে অথবা কোন কারণে অক্ষম হয়ে পড়ে তাহলে অন্য কারও দ্বারাও করানো যাবে। ঐ ব্যক্তির অস্বীকার এবং অক্ষমতা ছাড়াই যদি ওয়ারিশ বা দায়িত্বশীলগণ অন্য কাউকে হজ্জে পাঠিয়ে দেয় তাহলেও আদেশদাতার ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। যদি বদলী হজ্জের ওসিয়তকারী শুধু এতটুকু বলে যে, আমার পক্ষ হতে যেন বদলী হজ্জ করিয়ে দেয়া হয় এবং হজ্জের জন্য কাউকে নির্দিষ্ট করে না যায় তাহলে ওয়ারিশগণ পরামর্শ করে যে কাউকে ইচ্ছা বদলী হজ্জে পাঠাতে পারে। এতে ওসিয়তকারীর ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে।

পনেরো ও ষোলোতম শর্ত : যাকে বদলী হজ্জ করানোর জন্য পাঠানো হবে সে যেন হজ্জটি হাতছাড়াও না করে এবং নষ্টও না করে। ইহরাম বাঁধার পর উকূফে আরাফার পূর্বে স্ত্রী সহবাস দ্বারা হজ্জ নষ্ট হয়ে যায়, আর ইহরাম বাঁধা সত্ত্বেও উকূফে আরাফা না করলে হজ্জ ফউত অর্থাৎ হাতছাড়া হয়ে যায়। হাজী সাহেব যদি হজ্জ নষ্ট কিংবা হাতছাড়া করে দেয় তাহলে প্রেরণকারীর হজ্জ আদায় হবে না। সে ক্ষেত্রে হজ্জ বিনষ্টকারীকে প্রেরণকারীর সমুদয় অর্থ ফেরত দিয়ে দিতে হবে এবং পরবর্তী বছর হজ্জকারী নিজ অর্থ ব্যয়ে কাযা হজ্জ আদায় করবে কিন্তু এই কাযা হজ্জটিও প্রেরণকারীর পক্ষ হতে আদায় হবে না বরং হজ্জ বিনষ্টকারীর নিজস্ব হজ্জ বলে গণ্য হবে। কাজেই প্রেরণকারীকে আলাদাভাবে নিজের হজ্জ করাতে হবে।

আর হজ্জ হাতছাড়াকারীর দুই অবস্থা। এক. নিজ গাফিলতি ও উদাসীনতার কারণে হজ্জের কোন রোকন আদায় করতে না পারা। এক্ষেত্রেও হজ্জকারীকে প্রেরণকারীর হজ্জের খাতে প্রদত্ত অর্থ ফেরত দিতে হবে এবং নিজের হাতছাড়া হজ্জের কাযা নিজ অর্থ ব্যয়ে করে নিতে হবে। এই কাযা দ্বারাও প্রেরণকারীর ফরয হজ্জ আদায় হবে না এমনকি স্বয়ং হজ্জকারীর ফরয হজ্জও আদায় হবে না। অর্থাৎ পরবর্তীতে যদি তার হজ্জ করার সামর্থ্য অর্জিত হয় তাহলে আলাদাভাবে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে। দুই. কোন আসমানী বালা, অসুস্থতা অথবা গ্রেফতার হওয়ার কারণে হজ্জের আরকানসমূহ আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়া। এমতাবস্থায় তাকে পরবর্তী বছর হজ্জের কাযা করতে হবে এবং প্রেরণকারীকে জরিমানাও দিতে হবে না। তবে পরবর্তী বছরের কাযা হজ্জ দ্বারা

প্রেরণকারীর ফরয হজ্জ আদায় হতে পারে, যদি কিনা প্রেরণকারী তাকে নির্দেশ দেয় এবং এই কাযা হজ্জে প্রেরণকারীর হজ্জের নিয়ত করা হয়।

সতেরো ও আঠারোতম শর্ত : বদলী হজ্জ আদায়কারী শুধুমাত্র একটি হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। অর্থাৎ একই সময়ে নিজের ও প্রেরণকারীর পক্ষ হতে দুটি হজ্জের ইহরাম বাঁধবে না। অনুরূপভাবে একটি মাত্র বদলী হজ্জের ইহরাম বাঁধাও শর্ত। অর্থাৎ একই সঙ্গে দুই ব্যক্তির পক্ষ হতে বদলী হজ্জের নিয়ত করে ইহরাম বাঁধতে পারবে না।

উনিশতম শর্ত : হজ্জকারী ব্যক্তি হজ্জে প্রেরণকারীর মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধবে। অর্থাৎ প্রেরণকারীর আবাসভূমি থেকে মক্কা শরীফ গমনের ক্ষেত্রে যে মীকাত পথে পড়বে সেখান থেকেই বদলী হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। উদাহরণত বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান থেকে হজ্জে গমনকারীদের মীকাত হল ইয়ালামলাম। যদি বদলী হজ্জকারী দেশ থেকে উমরার ইহরাম বাঁধে এবং উমরা আদায়ের পর হালাল হয়ে হজ্জের সময় আবার মক্কা থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধে যেমনটি তামাত্তু হজ্জের সাধারণ নিয়ম– তাহলে যেহেতু হজ্জের মীকাতটি প্রেরণকারীর মীকাতের অন্তর্ভুক্ত নয় এ জন্য প্রেরণকারীর হজ্জ আদায় হবে না। ফলে প্রেরণকারীকে তার প্রদত্ত অর্থ ফেরত দেয়া হজ্জকারীর জন্য জরুরী হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

বিশতম শর্ত : হজ্জে প্রেরিত ব্যক্তি প্রেরণকারীর শর্তাবলী লঙ্ঘন করতে পারবে না। উদাহরণত প্রেরণকারী তাকে হজ্জে ইফরাদ করার কথা বলেছিল, তা সত্ত্বেও সে হজ্জের সঙ্গে উমরা মিলিয়ে কিরান করে নিল তাহলে এতে প্রেরণকারীর হজ্জ আদায় হবে না। প্রেরিত ব্যক্তি যদি উমরার নিয়তও প্রেরকের পক্ষ হতে করে সে ক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা রহ. প্রেরকের নির্দেশ লঙ্ঘন করার কারণে হজ্জটি প্রেরকের পক্ষ হতে না হওয়ার এবং তাকে তার প্রদত্ত অর্থ ফেরত দেয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। তবে তার দুই প্রখ্যাত শাগরেদ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এক্ষেত্রে হজ্জটি প্রেরকের পক্ষ হতে আদায় হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তো ইমাম আবূ হানীফা রহ.এর মতে যেহেতু এই বিধানের ভিত্তি হল, প্রেরকের নির্দেশ লঙ্ঘন– এ জন্য যদি প্রেরক নিজেই কিরানের অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে বক্তব্যের দাবী হল হজ্জটি সর্বসম্মতিক্রমেই প্রেরকের পক্ষ হতেই আদায় হয়ে যাবে। এটা হল কিরানের বিধান। আর যদি প্রেরিত ব্যক্তি উমরার সংযোজন তামাত্তুর পদ্ধতিতে করে থাকেন অর্থাৎ প্রেরণকারীর মীকাত হতে শুধু উমরার ইহরাম বেঁধে উমরা করে নেন অতঃপর মক্কা শরীফ হতে হজ্জের ইহরাম বাঁধেন তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রেরণকারীর হজ্জ আদায় হবে না এবং প্রেরিতের ওপর অর্থ ফেরতের জরিমানা ওয়াজিব হবে।

নফল বদলী হজ্জ ও উমরার মাসআলা

কোন ব্যক্তি যদি দয়া ও অনুগ্রহ হিসেবে নিজ অর্থ দ্বারা কারও পক্ষ হতে নফল বদলী হজ্জ ও নফল বদলী উমরা করে তাহলে এ ক্ষেত্রে উল্লেখিত শর্তাবলীর কোন পাবন্দী নেই। তবে প্রেরণকারীর অর্থ দ্বারা নফল বদলী হজ্জ ও নফল বদলী উমরা করা হলে উক্ত বিশটি শর্তের তিনটি– যা প্রেরণকারীর সত্তার সঙ্গে সমৃক্ত– সেগুলো প্রযোজ্য হবে না। তবে অবশিষ্ট শর্তাবলী যথারীতি বহাল থাকবে। অপ্রযোজ্য শর্ত তিনটি এই (ক) যার পক্ষ হতে হজ্জ করা হবে তার উপর হজ্জ ফরয হওয়া এবং নিজে তা পালন করতে অক্ষম হওয়া। (খ) অক্ষমতা স্থায়ী হওয়া। (গ) বদলী হজ্জ করানোর পূর্বেই অক্ষম হওয়া।

মাসআলা : উপর্যুক্ত শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে যার পক্ষ হতে ফরয হজ্জ করা হবে বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতানুযায়ী এই হজ্জ ও উমরাটি তার বলেই গণ্য হবে। আর হজ্জ ও উমরা পালনকারী তাকে সহযোগিতা করার সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদনের পর প্রেরিত ব্যক্তি যদি তাওয়াফ বা উমরা করে তাহলে সেটা আবার তার নিজের পক্ষ হতেই হবে। অনুরূপভাবে নফল হজ্জ ও উমরার ক্ষেত্রেও প্রেরকের অর্থ দ্বারা করা হলে সেটা প্রেরকের বলে ধর্তব্য হবে আর হজ্জ উমরাকারী তার আমলের সাওয়াব লাভ করবে। অবশ্য কেউ যদি নিজ অর্থ দ্বারা নফল হজ্জ ও উমরা পালন করে এবং করার পর কাউকে তার সাওয়াব পৌঁছে দেয় তাহলে হজ্জ বা উমরাটি তার নিজের পক্ষ হতে হবে আর যাকে সাওয়াব পৌঁছাতে চায় সে সাওয়াব লাভ করবে।

মাসআলা : যে ব্যক্তি নিজের ফরয হজ্জ আদায় করেছে, তার জন্য নফল হজ্জ করার চেয়ে অন্য কারো পক্ষ হতে ফরয বদলী হজ্জ করে দেয়া উত্তম। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি অন্য কারও পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করে দেয় সে সাতটি হজ্জের সাওয়াব লাভ করে।

নিজের হজ্জ করেনি এমন ব্যক্তি দ্বারা বদলী হজ্জ করানো

ফরয বদলী হজ্জ এমন ব্যক্তিকে দিয়ে করানো উত্তম ও উচিত যিনি নিজের ফরয হজ্জ আদায় করেছেন- এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম সকলেই একমত। আর যিনি নিজের হজ্জ পালন করেননি এবং তার ওপর হজ্জ করা ফরযও হয়নি তাকে দিয়ে বদলী হজ্জ করানো জায়েয আছে। তবে তা মাকরূহে তানযীহী অর্থাৎ অনুত্তম। পক্ষান্তরে যার নিজের ওপরই হজ্জ ফরয হয়ে আছে এবং এখনো তা আদায় করেনি এমন ব্যক্তিকে বদলী হজ্জে পাঠানো মাকরূহে তাহরীমী অর্থাৎ নাজায়েয।

যার ওপর হজ্জ ফরয ছিল না, সে যদি কারও পক্ষ হতে বদলী হজ্জে গিয়ে প্রেরকের পক্ষ থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফে প্রবেশ করে, তাহলে বাইতুল্লাহর নিকটে পৌঁছার কারণে তার যিম্মায় নিজের হজ্জ ফরয হবে না। কারণ সে তো এ অবস্থায় মক্কায় পৌঁছেছে যে, অন্যের পক্ষ থেকে ইহরাম বাঁধার কারণে সে তার নিজের হজ্জ করতে সক্ষম নয়। আর দেশে ফেরার পর গরীব হওয়ার কারণে পুনরায় মক্কায় যাওয়ার সামর্থ্যও তার নেই। তবে কিছু সংখ্যক উলামায়ে কেরামের মতে, যদিও এ ব্যক্তির যিম্মায় আগে হজ্জ ফরয ছিল না কিন্তু বাইতুল্লাহ দর্শনের ফলে তার ওপর হজ্জ ফরয হয়ে গিয়েছে। কাজেই তাদের মতে এ ব্যক্তির জন্য জরুরী হল, সে সারা বছর সেখানেই অবস্থান করবে এবং পরবর্তী বছর নিজের হজ্জ আদায় করে তবেই দেশে ফিরবে। তবে বর্তমানে যেহেতু সেখানে এত দীর্ঘ অবস্থানের অনুমতি ও বন্দোবস্ত কোনটিই সম্ভব নয়। এজন্য প্রথমোক্ত মতের ওপর আমল করা যেতে পারে এবং দলীল প্রমাণের আলোকে এ মতটিকেই অগ্রাধিকারযোগ্য মনে হয়।

হজ্জ করানেওয়ালার দেশ বা শহর থেকে বদলী হজ্জ করানোর বিধান

হজ্জ করানেওয়ালার দেশ বা শহর থেকে বদলী হজ্জ করানোর শর্ত তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ওসিয়তকারীর রেখে যাওয়া পূর্ণ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা তার আবাসভূমি থেকে হজ্জ করানো সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে যদি এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা তা সম্ভব না হয় এবং ওয়ারিশগণও এক-তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত খরচ করতে

(২০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম রহ. দীনের এক অতন্দ্র প্রহরী!

হাফেয মাওলানা মনসূরুল হক

ভুবন। একটি পল্লীর নাম। একটি নিবিড় নিঝুম পল্লী। এ পল্লীটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলায় অবস্থিত।

ব্রিটিশ আমলের কথা। তখন এ পল্লীর গাঁয়ে নগরের কোন ছোঁয়া লাগেনি। এই ভুবন গ্রামে বাস করতেন মাওলানা আনওয়ার আলী। একজন সৎ, ও পরহেজগার আলেম হিসেবে তার যথেষ্ট খ্যাতি। স্ত্রী জোবায়দাকে নিয়ে তার ছোট এবং একক সংসার। তাই মনে অনেক আকুতি ছিল একটি সুসন্তানের। ১৮৯৬ সালের কথা। আল্লাহ তা'আলা তার আকুতি পূর্ণ করলেন। শুভক্ষণে এক ফুটফুটে সন্তানের জন্ম হল। মাওলানা আনওয়ার আলী ও মাতা জোবায়দা পরম আহ্লাদে অত্যন্ত আশা নিয়ে সন্তানের নাম রাখলেন তাজুল ইসলাম। ইসলামের মুকুট।

সময়ের হাওয়ায় দোল খেতে খেতে তাজুল ইসলাম বেড়ে উঠল। এখন সে রাখাল বালকের সাথে ভেড়া আর ছাগলের পাল নিয়ে ছুটে যায় সবুজ দিগন্তে। তবে স্বভাব-চরিত্রে রাখাল বালকের চেয়ে একেবারে ভিন্ন। কারো সাথে কোন ঝগড়া নেই, কোন মারামারি নেই। মাঝে মধ্যেই হারিয়ে যায় অনন্তলোকে। উদাস নয়নে কী যেন ভাবতে থাকে। যেন গুরু দায়িত্বভারে বিমূঢ় চিন্তাশীল মানুষের এক প্রতিচ্ছবি। ভেড়া আর ছাগল চরাতে চরাতে বালক তাজুল ইসলাম নিজের অজান্তেই নবী রাসূলদের চিরায়ত সুন্নাত পালন করে ফেললেন।

বালক তাজুল ইসলামের বয়স এখন আট বা ন'য়ের কোঠায়। পিতা আনওয়ার আলী ভাবলেন, বেশ হয়েছে। আর ছাগল চরানো নয়; এবার তাকে লেখাপড়া শিখতে হবে। শুরু হল তাজুল ইসলামের নতুন ভুবনে নতুন জীবন।

স্কুল ঘরে কয়েক দিন

মাওলানা আনওয়ার আলী ছেলেকে নিকটস্থ বেশ নামকরা এক স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। তাজুল ইসলাম এখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। দিন, সপ্তাহ গড়িয়ে মাস পেরুল। এভাবে কয়েক মাস। পিতা অবাক হয়ে দেখলেন ছেলে তার এখন আর ক্লাসের কোন বই পড়ে না। মাঝে মাঝে মোটা মোটা বই হাতে দেখা যায়। একদিন মাওলানা আনওয়ার আলী ছেলেকে ডেকে বললেন, ব্যাপার কী, তোমাকে ক্লাসের বই পড়তে দেখা যায় না! অন্যের মোটা মোটা বই হাতে কি কর? ছেলে তাজুল ইসলামের কণ্ঠ অত্যন্ত শান্ত, একেবারে শীতল। বলল, আব্বা! আমি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত সব বই মুখস্থ করে ফেলেছি। তাই সপ্তম শ্রেণীর বই পড়ছি। ছেলের কথা শুনে পিতা বিস্ময়ে হতবাক। মাত্র ন' মাসে এতো কিছু মুখস্থ করে ফেলেছে! ভাবনার জগতে ঘুরতে লাগলেন। কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। এই বিস্ময়-বালককে সারা পৃথিবীর বিস্ময় কীভাবে বানানো যায়। মনঃস্থির হয়ে গেল। না, আর ভাবনা নয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন, তাকে যোগ্য আলেম বানাবেন, নায়েবে নবী বানাবেন।

স্কুল থেকে মাদরাসার পথে

মাওলানা আনওয়ার আলী ছেলেকে জেটা গ্রামের মাওলানা আব্দুল করীমের কাছে নিয়ে আসলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেযগার। ইলম আর আমল তার জীবনকে পূর্ণতা দান করেছে। তাজুল ইসলাম প্রাথমিক কিতাবাদি তার কাছেই অধ্যয়ন করেছেন। তারপর ভর্তি হলেন শ্রীঘর মাদরাসায়। অসাধারণ মেধাবল এবং অস্বাভাবিক স্মৃতিশক্তির কারণে এই মাদরাসায় প্রত্যেক ক্লাসেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। একদা শৈশবের স্মৃতি মন্থন করতে করতে ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম বলেন, শৈশব থেকেই আমার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। এটা আল্লাহর দেয়া এক বিশেষ নিয়ামত। এতে আমার গর্বের কিছু নেই। তিনি ছিলেন স্বভাব-কবি। ছাত্র জীবনে অনায়াসেই সুন্দর সুন্দর উঁচুমানের আরবী কবিতা রচনা করে ফেলতেন। সুবিজ্ঞ কবিদের প্রতিভাও যেখানে ম্লান। শ্রীঘর মাদরাসায় কিছুকাল পড়াশোনা করার পর তিনি সিলেটের বাহুবল মাদরাসায় ভর্তি হন। বাহুবল থেকে সুনামের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে তদানীন্তন স্থানীয় শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সিলেটস্থ আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তখন সিলেট গভর্নমেন্ট আলিয়া মাদরাসার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম দেওবন্দের মুফতী আল্লামা সাহূল উসমানী রহ.। আল্লামা তাজুল ইসলামকে প্রথম দেখামাত্রই তিনি বলে উঠলেন, 'এ যুবক একজন বড় আলেম ও বুযুর্গ হবে'। আলিয়ায় পড়াকালীন তিনি মাঝে মধ্যে আরবীতে এত উঁচুমানের প্রবন্ধ ও কবিতা লিখে আল্লামা উসমানীর খিদমতে পেশ করতেন যে, হযরত উসমানী রহ.-এর মত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপণ্ডিতও হতবাক হয়ে যেতেন।

উচ্চশিক্ষা

আল্লামা তাজুল ইসলাম ১৩৩৮ হিজরীতে পৃথিবীখ্যাত আরবী বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে সেখানে চার বছর অধ্যয়ন করেন। গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আকাইদ, মানতিক, আরবী সাহিত্যসহ অন্যান্য বহু বিষয়ে। এ সময়ে তার স্মরণশক্তির অপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ নাম্বার পেতেন। শোনা যায়, দারুল উলূমের শিক্ষাজীবনে তিনি সনদসহ কয়েক হাজার হাদীস এবং বিখ্যাত ফিকহ-গ্রন্থ *হিদায়া* সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করেছেন। তার সহীহ বুখারীর উস্তাদ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর স্মরণশক্তিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনিও তাকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করতেন। তাছাড়া তার অন্যতম উস্তাদ শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ.ও ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত আলেম ও লেখক। আল্লামা উসমানী রহ. এর কাছে আল্লামা তাজুল ইসলাম রহ. সহীহ মুসলিম ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

সংগ্রামমুখর জীবন

আল্লামা তাজুল ইসলাম রহ. তার্কিক আলেম হিসেবে উপমহাদেশে খ্যাতি

অর্জন করেন। দেওবন্দের উস্তাদগণ তাকে বিভিন্ন সময় কাদিয়ানী ও রাফেজীদের সাথে বিতর্ক করার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঠাতেন।

কাদিয়ানীদের পরাজয় বরণ

একবার মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর একদল অনুসারী মিথ্যা নবীর পক্ষে বাহাস করার জন্য পাঞ্জাব থেকে দেওবন্দ আসল। তারা চ্যালেঞ্জ করে বলল, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যিনি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারীদের মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারেন? বাহাসের শর্ত ছিল, যারা হেরে যাবে তারা অপর পক্ষের মতামত সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন। এই চুক্তির উপর উভয় পক্ষের স্বাক্ষর নিয়ে উলামায়ে ইসলাম কিছুটা দ্বিধায় পড়েছিলেন। আল্লামা তাজুল ইসলাম তখন মিশকাতের (স্নাতক) ছাত্র। ঘটনাক্রমে তখন তার ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল। কাদিয়ানী পক্ষ মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী রচিত একটি কাব্য গ্রন্থের মাধ্যমে বাহাস করত। তারা দাবী করে যে, তাদের নবী সত্য এবং কাব্যগ্রন্থখানি তাদের নবীর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহীগ্রন্থ। তারা যুক্তি দেখাল, এই গ্রন্থ আল্লাহর ওহী না হলে তিনি এত উঁচুমানের কবিতা রচনা করলেন কিভাবে? কাজেই তোমরা সত্যবাদী হলে এর সমমানের কবিতার মাধ্যমে মোকাবেলা কর। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.-এর নির্দেশে মাওলানা তাজুল ইসলামকে পরীক্ষার হল থেকে বিতর্কস্থলে আনা হল। কাদিয়ানীদের কবিতা শুনে তিনি শুধু স্মিত হাসছিলেন। তখনই তিনি অল্প সময়ের মধ্যে ৮০টি এমন অনবদ্য আরবী কবিতা রচনা করে প্রতিপক্ষের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করেন যার উপমা প্রায় অসম্ভব। পাশাপাশি তিনি মির্জা গোলামের কবিতার অজস্র ভুলও ধরিয়ে দিলেন। ঘটনাস্থলেই অগণিত লোক শর্তমতে কাদিয়ানী পক্ষ ত্যাগ করে যথার্থ ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করল।

মাযহাব মানব কেন?

আল্লামা তাজুল ইসলাম ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ। বিশ্বের অনেক জায়গা থেকে তার ডাক আসত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য। আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনি তা সমাধা করতেন। তেমনি একটি ডাক এসেছিল তৎকালীন মিশরের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশ হতে এক একজন নির্বাচিত প্রাজ্ঞ আলেমে দীন শাহী আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করবেন। বিষয় বিশ্ব মুসলিমের এক মাযহাব শীর্ষক আলোচনা। উক্ত সভায় তখনকার পাকিস্তান সরকার এদেশ থেকে আল্লামা তাজুল ইসলাম সাহেবকে নির্বাচন করেন।

তিনি মিশর গমন করে ইজতিহাদ ও মাযহাব বিষয়ক মজলিসে হাজির হলেন। মজলিসের অন্যান্য বক্তাগণ সবাই একমত হলেন যে, মাযহাব মানার প্রয়োজন নেই। সবশেষে বাংলার সিংহ তাজুল ইসলাম বক্তব্য শুরু করলেন। তার বক্তব্য পূর্বের বক্তাদের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইজতিহাদ বিষয়ক প্রথম প্রশ্ন আসল, ইজতিহাদের দরজা কি বন্ধ হয়ে গেছে? তিনি বললেন, না, ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়নি; খোলাই আছে। কিন্তু মুজতাহিদ কোথায়? জনৈক চিন্তাবিদ জবাব দিলেন, আমরা বিভিন্ন দেশ হতে আগত একশত চারজন বিখ্যাত আলেম-উলামা একত্রিত হয়েও কি একজন ইমাম আবু হানীফা বা ইমাম শাফেয়ীর সমতুল্য হতে পারব না?

আল্লামা তাজুল ইসলাম দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন, না, পারব না, কখনোই না। এখানে এমন কেউ আছেন কি যার সিহাহ সিত্তার সকল হাদীস মুখস্থ আছে? পুরো মজলিস নীরব। কোন উত্তর এলো না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যার সিহাহ সিত্তার তিনটি কিতাবের সকল হাদীস মুখস্থ বা শুধু সহীহ বুখারীর সকল হাদীস বা তার অর্ধেক মুখস্থ আছে?

উপস্থিত সকলে না সূচক জবাব দিলে তিনি সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, বলুন তো, যুদ্ধের ময়দানে একশত গাধা একত্রিত হয়ে একটি ঘোড়ার কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে কি? সবাই নিরুত্তর রইলেন। এবার তিনি বললেন, যদি একটি ঘোড়ার কাজ একশত গাধা একত্রিত হয়েও না পারে, তাহলে বর্তমানের একশত আলেম একত্রিত হয়ে একজন ইমাম আবু হানীফা রহ. বা একজন ইমাম শাফেয়ী রহ. কি করে হতে পারে? ঘোড়ার কাজ যেমন গাধা দ্বারা সম্ভব নয় তেমন সহীহ ইজতিহাদ পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ইমামগণ ব্যতীত সম্ভব নয়।

অতঃপর আল্লামা তাজুল ইসলাম রহ. এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করলেন। কুরআনের বেশুমার আয়াত ও শত শত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করলেন, বর্তমানে মুসলমানদের জন্য ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে হলে মাযহাব অনুসরণের বিকল্প নেই।

আল্লামা তাজুল ইসলাম রহ. এর প্রামাণ্য ও দুর্লভ বক্তব্য শুনে গোটা সম্মেলন একেবারে বিস্মিত ও হতবাক হয়ে যায়। উলামায়ে কেরাম তার বক্তব্য সমর্থন করে তাকে 'হাফেযে হাদীস' এবং 'ফখরে বাঙ্গাল' উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর থেকেই তিনি এ নামে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন।

কর্মজীবন

মহামনীষী আল্লামা তাজুল ইসলাম রহ. এর মহান কর্মজীবন ছিল বিশাল এবং বিস্তৃত। আজীবন তিনি জাতির জন্য কর্মব্যস্ত থাকতেন। কর্মজীবনে তিনি সত্যের পথে দীনে হকের একজন মহান বীরের মতই সংগ্রাম করেছেন। তিনি বলতেন, চিন্তা-ভাবনার পর সত্যের জন্য আমি যে সঠিক নীতিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি কোন ধরনের প্রতিকূল অবস্থায়ই সেই নীতিকে পরিত্যাগ করতে পারি না। এজন্য লোকে আমাকে ভালো-মন্দ যাই বলুক না কেন, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। কারণ, আমি চাই শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি। তিনি কর্মজীবনে অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন কাদিয়ানী ফিতনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এমনকি কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তেও সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

দরস-তাদরীস

১৩৪২ হিজরীতে তিনি দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে প্রথমে ঢাকায় পরে কুমিল্লাস্থ জামি'আ মিল্লিয়ার শাইখুল হাদীস পদে ইসলামী শিক্ষার মহান অধ্যাপনা শুরু করেন। জামি'আ মিল্লিয়ায় তার সহকারী ছিলেন প্রখ্যাত আলেম ও মনীষী জামি'আ ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আতহার আলী রহ.। ১৩৪৫ হিজরীতে বি.বাড়িয়ার জামি'আ ইউনুসিয়ার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। মাদরাসার দায়িত্ব হাতে ইন্তিকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪২ বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন।

অধ্যাপনার সুদীর্ঘ সময়ে তিনি অসংখ্য প্রতিভাবান যোগ্য আলেম ও দীনের মুবাল্লিগ গড়ে তোলেন। যারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অত্যন্ত গৌরবদীপ্ত ভূমিকা পালন করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবন

তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর সাদাসিধে সাবলীল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তার প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়ও বড়ই

সাদাসিধে ছিল। মিষ্টি হাসি তার মুখে লেগেই থাকত। সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি তিনি ছিলেন উদারহস্ত। সাধারণ মানুষকেও তিনি খুব সম্মান করতেন। হক কথা সাহাবায়ে কেরামের মত অকপটে যথাসময়ে কর্তৃপক্ষের সামনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি ছিলেন নিয়মিত ইবাদত গোজার। তাহাজ্জুদ নামাযে তিনি রাতের বড় একটা অংশ কাটিয়ে দিতেন।

ওফাত

মৃত্যুশয্যায় তার মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তার সব সময়ের খাদেম হযরত মাওলানা নূরুল্লাহ সাহেব বলেছেন, হযরতের মুখের শেষ কথা ছিল, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'। শব্দটি মাঝে মধ্যে জীবদ্দশায় যেমন তার সুললিত কণ্ঠে তার বাসায় ও তার মসজিদে শোনা যেতো ঠিক সেই সুরে শেষবারের মত তার কণ্ঠে 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনিত হয়েছে। এরপর তিনি চিরতরে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা এপ্রিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তার ইন্তিকালে তদানীন্তন পাকিস্তান, ভারতসহ বহির্বিশ্বের আলেম সমাজ ও গুণীজনদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে এবং দেশে ধর্মপ্রাণ জনতা শোকে কাতর হয়ে পড়ে। তার মৃতদেহ যখন বি.বাড়িয়ায় আনা হয় তখন শহরে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। শহরের সমস্ত দোকান-পাট, সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালত মুসলিম ও অমুসলিমদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় বিশাল ঈদগাহে অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষাধিক শোকার্ত মানুষ জানাযার নামাযে অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত হন। সম্ভবত ইতিপূর্বে বি.বাড়িয়ায় এতবড় জামাআত আর দেখা যায়নি। জানাযার নামাযের ইমামতি করেন তার সারা জীবনের একনিষ্ঠ সাথী রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম রহ.। আল্লাহ তা'আলা দীনের এই মহান মুহাফিযকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন।

লেখক : মুদাররিস; জামি'আ ইলয়াসিয়া ইসলামিয়া, হাজারীবাগ, ঢাকা।

(১৭ পৃষ্ঠার পর, বদলী হজ্জ)

সম্মত না হয় তাহলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা যেখান থেকে হজ্জ করানো সম্ভব হয় সেখান থেকেই হজ্জ করিয়ে দিবে। অনুরূপভাবে ওসিয়তকারী নিজেই যদি তার আবাসভূমি ব্যতীত অন্যত্র থেকে বদলী হজ্জ করানোর কথা বলে যায় তাহলে দায়িত্বশীলগণ তার বর্ণিত স্থান থেকেই হজ্জ করিয়ে দিবে।

বদলী হজ্জে কিরান এবং তামাত্তু হজ্জ করার বিধান

বদলী হজ্জের ক্ষেত্রে যদিও দলীল প্রমাণের আলোকে হজ্জ করানেওয়ালার অনুমতি সাপেক্ষে কিরান এবং তামাত্তু উভয় হজ্জ করার বৈধতার প্রাধান্য অনুমিত হয়। কিন্তু এর বিপরীতেও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের ফাতাওয়া রয়েছে। অর্থাৎ তাদের মতে তামাত্তু হজ্জ করা হজ্জ করানেওয়ালার অনুমতি সাপেক্ষেও বৈধ নয়। তো ব্যাপার যেহেতু ফরয নিয়ে তাই সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। এজন্য যদ্দুর সম্ভব বদলী হজ্জে ইফরাদ বা কিরান করবে; তামাত্তু করবে না। কিন্তু বর্তমানে হজ্জ-উমরা করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের এই স্বাধীনতা নেই যে, সে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী যখন যেখানে খুশি যাতায়াত করতে পারে এবং দীর্ঘ ইহরাম এড়ানোর জন্য হজ্জের দিনগুলোর একেবারে নিকটবর্তী সময়ে সফর করতে পারে। সর্বক্ষেত্রেই সরকারী কঠিন বিধি-নিষেধ তার পিছু লেগে আছে। এজন্য যদি কোন বদলী হজ্জকারী হজ্জের অনেক পূর্বে সফর করতে বাধ্য হয় এবং দীর্ঘ ইহরামকালীন নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন মনে করে তাহলে প্রেরকের সম্মতি নিয়ে তার জন্য তামাত্তু হজ্জ করারও অবকাশ রয়েছে। (আল্লাহ তা'আলাই সর্ব বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত।)

বদলী হজ্জের জরুরী খরচাদি

বদলী হজ্জের প্রয়োজনীয় সকল খরচাদি যথা- যাতায়াত, প্রয়োজন মাফিক অবস্থান, হজ্জের দিনসমূহের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, খানা-পিনার জরুরী সামানা, কাপড় পরিষ্কারের ব্যয়, থাকার জন্য ঘর বা তাঁবু ইত্যাদি– এই সব কিছুর ব্যয় নির্বাহ যিনি বদলী হজ্জ করাচ্ছেন তার দায়িত্বে। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ এ সকল খাতের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তবে যুগের পরিবর্তনে প্রয়োজনও বদলে যায়। এজন্য বদলী হজ্জে গমনকারী ব্যক্তির উচিত হল, সতর্কতার সঙ্গে এ জাতীয় প্রয়োজনগুলো নির্ধারণ করা এবং এ সকল খাতে অপব্যয় ও অতি সংকোচন ব্যতীত মধ্যপন্থায় ব্যয় নির্বাহ করা। হাজী সাহেবদের ব্যয়ের এমন কিছু খাতও রয়েছে, যে সব খাতে বদলী হজ্জ করানেওয়ালার অর্থ ব্যয় করা বৈধ নয়। বরং সে সকল খাতে হাজী সাহেবকে নিজ অর্থ ব্যয় করতে হবে। উদাহরণত উযূ-গোসলের পানির মূল্য ও চিকিৎসা ব্যয় হাজী সাহেবের নিজ অর্থ থেকে সম্পাদন করতে হবে। অনুরূপভাবে কাউকে তার খানা-পিনায় শরীক করা, কাউকে মেহমানদারী করা তাকে নিজ অর্থ হতেই আঞ্জাম দিতে হবে। তবে বদলী হজ্জে প্রেরণকারী যদি হাজী সাহেবকে এ জাতীয় মামুলী ব্যাপারে উদারতার সঙ্গে ব্যয় করার অনুমতি দিয়ে দেন– এবং হাজী সাহেবকে পেরেশানী থেকে বাঁচানোর জন্য এভাবে অনুমতি দেয়া উচিতও বটে– তাহলে হাজী সাহেব এ সকল ব্যয়ও বদলী হজ্জ করানেওয়ালার অর্থ হতে নির্বাহ করতে পারবে।

ইহরামের কাপড় এবং সফরে ব্যবহার্য আসবাবপত্র হজ্জ করানেওয়ালার অর্থ দ্বারা ক্রয় করা বৈধ। কিন্তু হজ্জ সমাপনের পর এ সকল আসবাব এবং বেঁচে যাওয়া অর্থ হজ্জ করানেওয়ালাকে কিংবা তার ওয়ারিশদেরকে ফেরত দিতে হবে। হাজী সাহেব যদি এসব সামানা ও বেঁচে যাওয়া অর্থ তার মালিকানায় অন্তর্ভুক্তির শর্তও করে থাকেন তবু তা ধর্তব্য হবে না; মালিককে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। তবে যিনি হজ্জ করাচ্ছেন তিনি যদি এ সব সামানা ও বেঁচে যাওয়া অর্থ হাজী সাহেবের জন্য হাদিয়া বলে ব্যক্ত করেন কিংবা এগুলো হাজী সাহেবের মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হবে বলে ওসিয়ত করে যান সেক্ষেত্রে ফেরত দেয়া জরুরী নয়।

হজ্জের সফরে হাজী সাহেবকে পথিমধ্যে কোথাও অবস্থান করতে হলে কিংবা হজ্জের পূর্বে এবং মক্কা বা মদীনায় যানবাহনের যাত্রা বা তাতে আসন পাওয়ার প্রতীক্ষায় কিছু সময়/দিন/মাস অবস্থান করতে হলে, এ অবস্থানকালীন সময়ের খরচাদি হজ্জ করানেওয়ালার অর্থ হতে গ্রহণ করা হবে। চাই এ অবস্থান পনেরো দিনের কম হোক বা বেশি। তবে হাজী সাহেব যদি নিজ প্রয়োজনে কোথাও অতিরিক্ত সময় অবস্থান করেন তাহলে সে সময় বা দিনগুলোর খরচাদি তার নিজ অর্থ থেকে করতে হবে।

হজ্জ করানেওয়ালা যদি হাজী সাহেবকে তৃতীয় শ্রেণির যানবাহনে সফর করার খরচ দিয়ে থাকেন আর হাজী সাহেব প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণির যানবাহনে সফর করেন অথবা আরও উন্নত কোন যানবাহন ব্যবহার করেন তাহলে অতিরিক্ত ব্যয় হাজী সাহেবকে তার নিজ অর্থ থেকে নির্বাহ করতে হবে।

সংগ্রহ : জাওয়াহিরুল ফিকহ ৪/২০৩-২২৭
যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ।
অনুবাদ : মাওলানা আবূ সাইম
ইমাম, বছিলা বড় মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হযরত আদম আলাইহিস সালাম

মাওলানা আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত আদম আ. এর সৃষ্টির হিকমত

ফেরেশতা জাতি মহান আল্লাহ তা'আলার এমন এক সৃষ্টি যাদের মধ্যে গুনাহ করার যোগ্যতাই নেই। এর বিপরীতে শয়তান এমন এক সম্প্রদায় যারা সর্বদা 'মন্দে'র আঁধারে নিমজ্জিত। মহান আল্লাহ তা'আলা তাই ইচ্ছা করলেন, এমন এক সৃষ্টির যা হবে এ দুয়ের মাঝামাঝি। যাদের মাঝে ভালো কাজের যোগ্যতা যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে মন্দ কাজের আকর্ষণও। ভালো ও মন্দের, সত্য ও অসত্যের, আলো-আঁধারীর মাঝে মহান মালিকের আনুগত্যই যাদের দিশারী হবে এবং যাদেরকে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে আল্লাহর খলীফারূপে আবির্ভূত করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

অর্থ : আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতারা বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা প্রতিনিয়ত আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, তোমরা যা জান না। (সূরা বাকারা- ৩০)

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের কাছে যখন মানব সৃষ্টির ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন তখন মানব প্রকৃতি ও তার ভালো-মন্দ কর্মের যোগ্যতার বিষয়েও অবগত করলেন। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/৯৯, তাফসীরে কুরতুবী [সূরা বাকারা- ৩০], মা'আরিফুল কুরআন [মুফতী শফী রহ. কৃত] ১/১৮)

মানব প্রকৃতির ভালো-মন্দ অবগত হয়ে ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার কাছে নতুন এ সৃষ্টির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। জিজ্ঞাসার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করা উদ্দেশ্য ছিল না; উদ্দেশ্য ছিল সদা-সর্বদা মহান আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বে রত ফেরেশতা জাতির উপস্থিতি সত্ত্বেও ভালো-মন্দের যোগ্যতা সম্পন্ন নতুন এ মানব জাতির সৃষ্টির হিকমত সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا على وجه الاعتراض والتنقص لبني آدم والحسد لهم.

অর্থ : ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা ছিল মানব সৃষ্টির হিকমত সম্পর্কে অবগতি লাভের উদ্দেশ্যে; মানুষের প্রতি হিংসাবশত তাদের সম্মানহানীর উদ্দেশ্যে নয়। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/৯৯)

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতে اني اعلم ما لا تعلمون দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির সেই হিকমতের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। মুফতী শফী সাহেব রহ. এই হিকমতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যে, যেভাবে তিনি ফেরেশতার ন্যায় একটি নিষ্পাপ মাখলুক সৃষ্টি করেছিলেন যাদের দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভবই নয়, যেমনিভাবে তিনি শয়তান সৃষ্টি করেছিলেন, যাদের মাঝে ভালো কাজের কোন যোগ্যতাই নেই, তেমনিভাবে তিনি (এ দুয়ের স্বভাব প্রকৃতির সমন্বয়ে) ভালো-মন্দ এবং নেকী-বদীর জযবা ও স্পৃহার সংমিশ্রণে এমন একটি মাখলূক সৃষ্টি করতে চাইলেন যারা মন্দ কাজের স্পৃহাকে অবদমিত করে কল্যাণের পথে অগ্রগামী হবে এবং (এভাবে আনুগত্যের মাধ্যমে) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে। (মা'আরিফুল কুরআন [সূরা বাকারা- ৩০])

সৃষ্টি দিবস

হযরত আদম আ. এর সৃষ্টি দিবসটি ছিল শুক্রবার। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ত্ববারী রহ. বলেন,

قد تظاهرت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله عزوجل خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة وأنه أخرجه فيه من الجنة وأهبطه إلى الارض فيه وأنه فيه تاب عليه وفيه قبضه.

অর্থ : এ বিষয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত আদম আ. এর সৃষ্টি, জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়া, যমীনে অবতরণ, তাঁর তওবা কবুল হওয়া এবং তাঁর মৃত্যুবরণ এ সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা জুমু'আর দিন সংঘটিত করেছেন। (তারীখুত ত্ববারী ১/৭৫, আলকামেল ফিততারীখ ১/৩২)

সৃষ্টির উপকরণ

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করেন মাটি দ্বারা। যা আল্লাহ তা'আলার কুদরতের একটি অনন্য নিদর্শন। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় হযরত আদম আ. এর জন্য ভূপৃষ্ঠ থেকে সংগৃহিত মাটি বিভিন্ন রং ও প্রকৃতির উপাদান মিশ্রিত ছিল আর এ কারণেই মানুষ বর্ণ ও স্বভাবের দিক দিয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। (তারীখুত ত্ববারী ১/৬৩)

রূহ সঞ্চার

মাটি দ্বারা অবয়ব তৈরির পর মহান আল্লাহ তা'আলা মাথার দিক দিয়ে হযরত আদম আ. এর দেহে রূহ সঞ্চার করেন। (তারীখুত ত্ববারী ১/৬৪)

নামকরণ

آدم (আদম) শব্দটি আরবী اديم (আদীম) থেকে উদ্ভূত। اديم শব্দের অর্থ পৃষ্ঠদেশ, উপরিভাগ। যেহেতু হযরত আদম আ. কে اديم الارض (আদীমুল আরদ তথা ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের মাটি) দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে সেহেতু তাঁর নামকরণ করা হয়েছে آدم (আদম)। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. বলেন,

خلق آدم من أديم الارض فسمى آدم.

অর্থ : আদম আ. কে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের মাটি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এ কারণে আদম নাম রাখা হয়েছে। (তারীখুত ত্ববারী ১/৬৩)

হযরত আদম আ. কে সৃষ্টিজীবের নাম ও বৈশিষ্ট্য শিক্ষাদান

মহান আল্লাহ তা'আলা এরপর হযরত আদম আ. কে বিভিন্ন বস্তুর নাম ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

অর্থ : আর আল্লাহ্ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। তারপর বললেন, আমাকে

তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। তারা বলল, আপনি পুত-পবিত্র! আমরা কোনকিছুই জানি না, তবে আপনি যা আমাদেরকে শিখিয়েছেন (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয়ই আপনি প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। (সূরা বাকারা- ৩১, ৩২)

এ শিক্ষাদানের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত হাসান বসরী রহ. (১১০হি.) বলেন,

لما أراد الله خلق آدم قالت الملائكة لا يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه فابتلوا بهذا.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা যখন আদম আ. কে সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন ফেরেশতারা বলাবলি করতে লাগল যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী কোন মাখলূক সৃষ্টি করবেন না।

ফেরেশতাদের এ ধারণা ভুল প্রমাণে এবং সর্বোপরি হযরত আদম আ. এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে আল্লাহ তা'আলা এ পরীক্ষার আয়োজন করেন। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/১০০)

কিসের নাম শিখিয়েছেন? এ বিষয়টি মুফাসসিরীনে কেরামের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে কাসীর রহ. এর সিদ্ধান্ত হল,

والصحيح أنه علمه أسماء الذوات وأفعالها مكبرها ومصغرها كما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما.

অর্থ : বিশুদ্ধ মত হল আল্লাহ তা'আলা আদম আ. কে (পৃথিবীর) ছোট-বড় সকল সৃষ্টিজীবের নাম (এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্যের) জ্ঞান দান করেন, যেমনটি ইবনে আব্বাস রাযি. উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য

শিক্ষাদানের এ ঘটনার দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হওয়ার জন্য যে গুনটি লক্ষণীয়, তার প্রতি ফেরেশতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মুফতী শফী রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন, বিভিন্ন বস্তুর নাম শিক্ষাদানের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হল ফেরেশতাদেরকে এ বিষয়ে অবগত করা যে, পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হওয়ার জন্য 'মা'সূম' হওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয় নয়; বরং এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল পৃথিবীর সকল বস্তুর গুনাগুন, তা ব্যবহারের পদ্ধতি ও পরিণতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা। ... ফেরেশতাদের মনোভাব প্রকাশ যেহেতু অহঙ্কার বশত ছিল না; বরং কেবল বিনয়াবনত গোলামের মত নিজেদেরকে খেদমতের জন্য পেশ করা উদ্দেশ্য ছিল। তাই তৎক্ষণাৎ তারা বলে উঠল, سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (মা'আরিফুল কুরআন [সূরা বাকারা- ৩৩])

হযরত আদম আ. কে ফেরেশতা কর্তৃক সেজদা

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করার পরবর্তী সময়ে যে সকল সম্মানে ভূষিত করেন তন্মধ্যে ফেরেশতা কর্তৃক সেজদা করা অন্যতম। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪হি.) বলেন,

فهذه أربع تشريفات: خلقه له بيده الكريمة ونفخه فيه من روحه وأمره الملائكة بالسجود له وتعليمه أسماء الاشياء.

অর্থ : মহান আল্লাহ তা'আলা আদম আ. কে তাঁর সৃষ্টিলগ্নে চারটি মহা সম্মানে ভূষিত করেন। (এক) আপন কুদরতী হাতে অবয়ব সৃষ্টি করা, (দুই) সরাসরি নিজে রূহ সঞ্চার করা, (তিন) ফেরেশতা কর্তৃক সেজদা করানো এবং (চার) তাকে সকল বস্তুর নামের শিক্ষা দান করা। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/১০০)

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ফেরেশতা এবং জিনদেরকে হযরত আদম আ. এর প্রতি সেজদাবনত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। ইবলিসও এ নির্দেশের আওতাভূক্ত ছিল। ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.

অর্থ : এবং যখন আমি হযরত আদম আ. কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। (সূরা বাকারা- ৩৪)

মহান প্রভুর আদেশ মেনে সকল ফেরেশতা সেজদাবনত হল। কিন্তু অহঙ্কার বশত ইবলিস সেজদা করা থেকে বিরত থাকল এবং এ নির্দেশ অমান্যের স্বপক্ষে খোঁড়া যুক্তিও দাঁড় করালো। তারপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও বিতাড়িত হওয়ার পরও ক্ষমা ও সামান্যতম অনুতপ্ত হওয়ার বোধটুকুও সে হারিয়ে ফেলল। ফলে আল্লাহর দরবারে সম্মান ও মর্যাদার পরিবর্তে সে হল ধিকৃত এবং চির অভিশপ্ত।

শয়তানের যুক্তির অসারতা

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ.

অর্থ : শয়তান বলল, আমি তার (আদম) চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে মাটি দ্বারা। (সূরা সোয়াদ- ৭৬)

মহান মালিকের আদেশ পালনার্থে ইবলিসের করণীয় ছিল সমস্ত যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বে থেকে আদম আ. এর সামনে ফেরেশতাদের মত সিজদাবনত হওয়া। কেননা গোলামের জন্য মালিকের আদেশের সামনে যুক্তি পেশ করা নির্দেশ অমান্যের ধৃষ্টতা বৈ কিছুই নয়। উপরন্তু মাটির উপর আগুনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে তার যুক্তির অসারতাও বলার অপেক্ষা রাখে না। হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪হি.) বলেন,

والقياس إذا كان مقابلا بالنص كان فاسد الاعتبار ثم هو فاسد في نفسه فإن الطين أنفع وخير من النار فإن الطين فيه الرزانة والحلم والاناة والنمو والنار فيها الطيش والخفة والسرعة والاحراق.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার আদেশের বিপরীতে যুক্তির কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। আর যদি একটু চিন্তা করা হয় তবে শয়তানের এ যুক্তিও অসার প্রমাণিত হয়। কেননা মাটির মধ্যে রয়েছে গাম্ভীর্য, সহনশীলতা, ধীরস্থীরতা ও উৎপাদন ক্ষমতার মত অনন্য গুণাবলী। এর বিপরীতে আগুনে রয়েছে অস্থীরতা, চঞ্চলতা, ক্ষীপ্রতা ও দগ্ধ করার ক্ষমতা। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/১০১)

ইবলিসের বিতাড়ন

ফেরেশতাদের সম্মুখে যখন আদম আ. এর শ্রেষ্ঠত্ব ও খিলাফতের উপযুক্ততা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হল এবং ফেরেশতারাও তা বিনয়াবনত হয়ে মেনে নিলেন, অপরদিকে ইবলিস তার হঠকারীতার দরুণ ধিকৃত হল। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. কে জান্নাতে থাকতে নির্দেশ দিলেন এবং এর বিপরীতে ইবলিসকে অভিশপ্ত করে চিরদিনের জন্য আপন দরবার থেকে বের করে দিলেন। ইরশাদ হচ্ছে,

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

অর্থ : আল্লাহ বললেন, তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, তুমি বিতাড়িত। আর তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত। (সূরা হিজর- ৩৪, ৩৫)

এরপর আদম সন্তানের শত্রুতে পরিণত হওয়া ইবলিসের আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের দিল-দেমাগে, অস্থিমজ্জায় কুমন্ত্রণা দেয়ার সুযোগ দিয়ে দিলেন। পাশাপাশি মুমিন বান্দাদের সান্ত্বনার নিমিত্তে এ ঘোষণাও করে দিলেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

অর্থ : বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা যুমার- ৫৩)

হযরত হাওয়া আ.

এরপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. এর বাম পাজরের হাড্ডি থেকে হযরত হাওয়া আ. কে সৃষ্টি করলেন এবং حَيٌّ (প্রাণের অধিকারী) তথা হযরত আদম আ. থেকে সৃজিত হওয়ায় তার নাম রাখা হল حواء (হাওয়া)। (তারীখুত ত্বাবারী ১/৬৯, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/১০৩)

হযরত আদম আ. এর পরীক্ষা

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম ও হাওয়া আ. কে আসমানে জান্নাতুল মাওয়াতে থাকার সুযোগ দিলেন। সাথে সাথে পরীক্ষাস্বরূপ তাদেরকে একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করলেন। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/১০৪, তারীখুত ত্বাবারী ১/৭১)

শয়তান যেহেতু হযরত আদম আ. কে সেজদা না করার কারণে অভিশপ্ত হয়েছিল, এ কারণে সে সুযোগ সন্ধানী ছিল যে, কিভাবে আদম আ. আল্লাহর অভিশপ্ত হয়। (মা'আরিফুল কুরআন [সূরা বাকারা- ৩৬])

সুযোগ পেয়ে সে নিজেকে আদম ও হাওয়া আ. এর পরম হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে উপস্থাপন করল এবং আদম ও হাওয়া আ. কে ধোঁকা দিতে সক্ষম হল। পবিত্র কুরআনে এ সংশ্লিষ্ট ঘটনার বর্ণনা এভাবে হয়েছে,

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ.

অর্থ : (শয়তান বলতে লাগল,) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও-কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সে দিকেই আকৃষ্ট করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষফল খেয়ে ফেলল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষফল খেতে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা আ'রাফ- ২০-২২)

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়ে কিভাবে শয়তান পুনঃবার জান্নাতে ঢুকে আদম ও হাওয়া আ. কে ধোঁকা দিল?

মুফাসসিরীনে কেরাম অনেকেই এ প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء أغواهما مشافهة... وقالت طائفة إن إبليس لم يدخل الجنة إلى آدم بعد ما أخرج منها وإنما أغوى بشيطانه وسلطانه ووسواسه التي أعطاه الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.

অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস রাযি.সহ অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত হল, শয়তান তাদেরকে সামনাসামনি ধোঁকা দিয়েছিল...। আর কারো কারো মত হল, জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর ইবলিস হযরত আদম আ. এর কাছে জান্নাতে প্রবেশ করেনি। বরং (দূর থেকেই) আল্লাহ প্রদত্ত কুমন্ত্রণার ক্ষমতাবলে তাদের ধোঁকা দিয়েছিল। যেমনটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তান বনী আদমের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে। (তাফসীরে কুরতুবী [সূরা বাকারা- ৩৬])

মুফতী শফী সাহেব রহ. মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থে লিখেন, কুমন্ত্রণা প্রদানের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করার কোন প্রয়োজন নেই। বরং আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে দূর থেকে কুমন্ত্রণা দেয়ার ক্ষমতাও দিয়ে রেখেছেন। আর যদি জান্নাতে প্রবেশ ও সরাসরি প্ররোচনা দানের বিষয়টিকে মেনে নেয়া হয় তবে তারও বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে। যা অনুসন্ধানের পেছনে পড়া অনর্থক কাজ বৈ কিছু নয়। (মা'আরিফুল কুরআন [সূরা বাকারা- ৩৬])

আদম আ. এর ক্ষমাপ্রাপ্তি

শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্ররোচিত হয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যমীনে অবতরণের নির্দেশ দিলেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'অনন্তর আমি (আল্লাহ তা'আলা) বললাম, তোমরা নিচে নেমে যাও'। (সূরা বাকারা- ৩৬)

হযরত আদম আ. অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য দু'আ শিখিয়ে দিলেন। ইবনে আব্বাস রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত উক্ত দু'আ হল,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

(সূরা আ'রাফ- ২৩, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/১১১)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম ও হাওয়া আ. এর দু'আ কবুল করলেন। ইরশাদ হচ্ছে,

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

অর্থ : অতঃপর হযরত আদম আ. স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। (সূরা বাকারা- ৩৭)

শয়তানের সফলতা কতটুকু?

শয়তানের উদ্দেশ্য ছিল হযরত আদম আ. কে চিরতরে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাত্রে পরিণত করা। কিন্তু সে তার এ হীন উদ্দেশ্যে সফল হয়নি। ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

ولم يقصد إبليس -لعنه الله- إخراجه منها وإنما قصد إسقاطه من مرتبته وإبعاده كما أبعد هو فلم يبلغ مقصده ولا أدرك مراده بل ازداد سخنة عين وغيظ نفس وخيبة ظن. قال الله جل ثناؤه: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (طه:١٢٢) فصار عليه السلام خليفة الله في أرضه بعد أن كان جارا له في داره.

অর্থ : কুমন্ত্রণা দ্বারা ইবলিসের উদ্দেশ্য হযরত আদম আ. কে জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়ায় অবতরণ করানো ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল সে নিজে যেভাবে আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হয়েছে, আদম আ. কেও সেভাবে বিতাড়িত ও অপদস্থ করা। কিন্তু তার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অনন্তর তার প্রতিপালক তাকে কবুল করে নিলেন, তার প্রতি অনুগ্রহ করলেন, তাকে সৎপথে কায়েম রাখলেন– (সূরা ত্বোয়া-হা- ১২২)। যে কারণে আদম আ. জান্নাতে থাকাকালে ছিলেন আল্লাহরই প্রতিবেশী আর যমীনে অবতরণের পর হলেন আল্লাহর খলীফা। (তাফসীরে কুরতুবী [সূরা বাকারা- ৩৫])

এ কারণেই মুফতী শফী সাহেব রহ. বলেন, **(৩০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)**

এ যুগের মাসায়েল

বিজ্ঞাপন বিনির্মাণ ও প্রচার : শরয়ী নীতিমালা

মুফতী হাফিজুর রহমান

অবতরণিকা

একটি সময় ছিল যখন বিজ্ঞাপনের সাথে পেশাগত কোনো বিষয়ের সংযোগ ছিল না। কিন্তু হালের অত্যাধুনিক আকাশ সংস্কৃতির বাতাবরণে বিজ্ঞাপন একটি বৈশ্বিক এবং একাডেমিক রূপ পরিগ্রহ করে বসেছে। এ নিয়ে বিস্তর লেখা-পড়া ও গবেষণা-চর্চা হচ্ছে। আজ বিজ্ঞাপনী গোলক ধাঁধায় মানুষ নানা রকম পণ্য সেবায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। বিজ্ঞাপনের বাকচাতুরতা ও যাদুমন্ত্রে পণ্য-বাজারের ব্যপ্তি হুহু করে বেড়ে চলছে।

বস্তুত মানুষ মাত্রই নীতিমান। নীতি নৈতিকতার প্রতি তার সদিচ্ছা ও আগ্রহের বিষয়টি আবহমান কাল থেকেই স্বীকৃত। পারলৌকিক জীবনধারা ছাপিয়ে জাগতিক বিষয়েও নীতি নৈতিকতার স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট সংবিধান হলো ইসলামী জীবন বিধান। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তাবৎ জ্ঞান গবেষণায় আজ এ বিষয়টি অটল সত্য প্রমাণিত। তাই বিজ্ঞাপনের বিষয়টিও ইসলামী বিধি নিষেধের আওতামুক্ত কোনো বিষয় নয়। এর সাথেও জড়িয়ে আছে ইসলামী জীবন ধারার সুস্পষ্ট নীতিমালা। মূলত বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাটি ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প সাহিত্যসহ সকল অঙ্গনে একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বস্তুনিষ্ঠভাবে বলতে গেলে ক্রমাগ্রসরমান উন্নতির এ যুগে এর প্রয়োজনীয়তা সত্যিই অপরিসীম। ইসলামী ধর্মতত্ত্ব মতে বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটি অবৈধ কিছু নয়। কিন্তু হালে বিজ্ঞাপনের যে গড্ডালিকা প্রবাহ দৃশ্যমান এবং তাতে নিত্যনতুন যে হারে অবৈধ সংযোজনার প্রবৃদ্ধি হচ্ছে তাতে বিজ্ঞাপনের সহজাত এবং স্বাভাবিক গতিধারা আর অক্ষুণ্ন নেই। ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে আর বিধানসম্মত বলার অবকাশ অবশিষ্ট নেই। নীতি-নৈতিকতার সম্প্রসারণ এবং দেশ ও জাতির ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরার সদিচ্ছা ও তাগিদেই বিজ্ঞাপন বিষয়ক এ নিবন্ধের অবতারণা। বিজ্ঞাপন শিল্পটির আদ্যোপান্ত তুলে ধরার মানসে আমরা প্রথমে এর বৈষয়িক দিকটির সুবিস্তর আলোচনার দিকে অগ্রসর হবো। যাতে বিজ্ঞাপনের একটি সার্বিক এবং প্রামাণ্য চিত্র অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সামনে ফুটে উঠে এবং বিধি নিষেধের ব্যাপারটি সাহজিকভাবে বোধগম্য হয়। এরপর আমরা বিজ্ঞাপন বিনির্মাণ এবং তার প্রচার প্রসারের ব্যাপারে নীতি-নৈতিকতা এবং ধর্মীয় নানা দিক নিয়ে সুবিস্তর একটি আলোচনার প্রয়াস পাবো। কারণ কোনো বিষয়ের বিধি নিষেধ সম্বন্ধে অবগতি লাভের পূর্বে সে বিষয়টি সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত ধারণা লাভ করা শাস্ত্রগতভাবেই একটি অপরিহার্য বিষয়। বিস্তৃত ধারণা লাভের পূর্বে বিধি নিষেধ বর্ণনা করতে গেলে তাতে খুঁত থেকে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

বিজ্ঞাপন পরিচিতি

জ্ঞাপন অর্থ জ্ঞাত করণ, সংবাদদান, নিবেদন। এ 'জ্ঞাপন' শব্দটির সাথে 'বি' উপসর্গ যুক্ত হয়ে বিজ্ঞাপন শব্দটির উদ্ভব হয়েছে।

বাংলা অভিধানগুলোতে বিজ্ঞাপনের অর্থ করা হয়েছে, বিশেষভাবে জ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, সাধারণকে জানাইবার জন্য লেখন, ইশতিহার, নোটিশ।

সংসদ বাংলা অভিধান থেকে বিজ্ঞাপনের প্রচলিত পারিভাষিক রূপটি সহজেই অনুমিত হয়। পশ্চিম বাংলার এ অভিধানটিতে বিজ্ঞাপনের অর্থ করা হয়েছে, সংবাদপত্র ইত্যাদির সাহায্যে সাধারণ লোকের নিকট প্রচার। অনলাইনে বিজ্ঞাপনটি আরেকটু সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বিজ্ঞাপন হলো, চিহ্নিত উদ্যোক্তা কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে ধারণা, পণ্য ও সেবার নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনা ও প্রসার। আরেকটু গুছিয়ে বললে, পণ্য বা সেবার প্রতি ভোক্তার দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে যে কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্য প্রেরণ বা প্রদর্শনই হলো বিজ্ঞাপন। বস্তুত বিজ্ঞাপন একটি একমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা। সাধারণত পণ্য ও সেবার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়ে থাকে।

ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞাপনের প্রতিশব্দ হলো, advertise। সংক্ষেপে ad ও প্রচলিত। আর আরবী ভাষায় النشرة (আননাশরা) এবং الاعلان (আলই'লান) হলো বিজ্ঞাপনের প্রতিশব্দ।

ইংরেজি advertise শব্দটি ল্যাটিন advertre এর বিবর্তিত রূপ। advertre এর অর্থ হলো, আবর্তিত করা বা ঘুরানো। অন্য একটি সূত্র মতে প্রাচীন ফরাসী শব্দ advertir (দেখানো) থেকে মধ্যযুগীয় ইংরেজী শব্দ advertisen (জানানো) হয়ে advertising শব্দটির উদ্ভব হয়েছে।

কালপরিক্রমায় বিজ্ঞাপনের সরল প্রবাহ

বিজ্ঞাপন যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। যোগাযোগ শব্দটি বস্তুত অন্যকে কোনো বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করণের সবগুলো উপায়-অবলম্বনকেই নির্দেশ করে। মানব জীবনে যোগাযোগের ধারা সে আদিকাল থেকে বিরাজমান। ভাষা হলো মানব সমাজের পারস্পারিক যোগাযোগের প্রথম সূত্র। লেখা আবিষ্কারের পূর্বকালে মানুষ ভাষা ছাড়াও হাত নাড়া, চিৎকার করা, ঢাকঢোল পিটানো, আগুন বা ধোঁয়া সৃষ্টি করা– প্রভৃতি মাধ্যমকে যোগাযোগ ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করতো। অবশ্য হস্ত-সংকেত কিংবা বাকধ্বনির সরব ব্যবহার আজকের মুঠোময় পৃথিবীর যুগেও যোগাযোগের ক্রিয়াশীল একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আদি যুগে মানুষ আগুনকে যোগাযোগের সাংকেতিক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে অন্যকে কোনো বিষয়ে অবহিত করণের প্রক্রিয়াটি সাধন করতো। উঁচু গাছের ডগায় উঠে মশাল নেড়ে কিংবা আগুনে তীর ছুড়ে শিকারীদের ফিরে আসার সংকেত দিতো। যোগাযোগ বা বিজ্ঞাপনের এ সাংকেতিক ব্যবহারটি প্রযুক্তিময় এ যুগেও সমতালে চলমান রয়েছে। সবুজের বুক চিরে বয়ে চলা মেঠো পথ ধরে টুংটাং নানা রকম শব্দ করে মালাই জাতীয় শিশু খাদ্যের পসরা সাজিয়ে আজো হেঁটে চলে আবহমান গ্রাম বাংলার ফেরিওয়ালা। বিজ্ঞাপনী সেসব সাংকেতিক শব্দের যাদুমন্ত্রে গ্রামের সহজ সরল ছেলে মেয়েরা ছেড়া জুতো আর ভাঙ্গা থালা, শিশি-বোতল কিংবা লোহা-লক্কর নিয়ে ছুটে আসে। অর্থলগ্নি বিহীন এ বিজ্ঞাপনে খুব সহজেই ফেরিওয়ালার শিশুখাদ্যগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়। ঢোল, থালা কিংবা প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী ধাতব বস্তু পিটিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচারের সাংকেতিক ব্যবহারটি এই সেদিনও গ্রাম বাংলার হাটে বাজারে চলমান ছিল। লেখা আবিষ্কারের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থাটি বেশ উন্নত হয়ে উঠে। লেখা আবিষ্কারের পথ ধরেই

যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাচীন অনুষঙ্গ চিঠি চালনার উদ্ভব ঘটে। চিঠি চালনাকে কেন্দ্র করেই ডাক ব্যবস্থার প্রচলন হয়। যোগাযোগের অগ্রগতির ক্ষেত্রে লেখা আবিষ্কারোত্তার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার। মুদ্রণ যন্ত্রের সহযোগে বই পুস্তক ও পত্রপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে লাখো মানুষের সাথে যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত এবং অবারিত হয়। আধুনিক জীবন যাত্রার আবশ্যিক অনুষঙ্গ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার প্রথম ব্যবহৃত যন্ত্র হলো টেলিগ্রাফ। বিজ্ঞানের মহা বিস্ময় বৈদ্যুতিক আবিষ্কারের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপুল পালাবদল ঘটে। ইমেইল, মোবাইল এবং নিকট অতীতের টেলিফোন, ফ্যাক্স ইত্যাদি হলো বিদ্যুত বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবদান। বস্তুত যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকতম উপায়টির সূচনা হয়েছিল রেডিও তথা বেতার যন্ত্র উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে। যোগাযোগ ব্যবস্থার সর্বশেষ সংযোজন হলো ইন্টারনেট। বিশ্বের কোটি কোটি কম্পিউটার সংযুক্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের এক বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। এ যোগাযোগ ব্যবস্থার পথ ধরেই কালে কালে বিজ্ঞাপনের গতিধারা আবর্তিত হয়েছে। এ ছিল ইতিহাসের গতিধারায় বিজ্ঞাপনের সরল প্রবাহ। বর্তমানে বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাটি একটি শক্তিমান কর্পোরেট এবং একাডেমিক শিল্প হিসেবে প্রাদুর্ভূত হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞাপনের ক্রমধারা

প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞাপনের মর্মবস্তু হলো, নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞাপন মানব সভ্যতায় বেশ প্রাচীন ইতিহাসের দাবিদার। দৃষ্টি কাড়া কিংবা তথ্যসেবা দেয়ার স্তর থেকে বাণিজ্যিক তথ্যের জানান দেয়া এবং মনোযোগ আদায় করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবেই বিজ্ঞাপনের প্রাথমিক ইতিহাস তৈরি হয়।

প্রচলিত বিজ্ঞাপন জগতের যাত্রা ঠিক কখন থেকে শুরু হয় তা সুনির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও ধারণা করা হয়, মানুষ যখন থেকে চাষাবাদ পেশায় আত্মনিয়োগ করে এবং ফসল কেটে ঘরে তোলে তখন থেকেই বিজ্ঞাপনের অভিযাত্রা শুরু হয়। তখন মানুষ জনসমাগম স্থলে ফসলী পণ্যের সামনে দাঁড়িয়ে সরব আওয়াজ তুলে পণ্য বিক্রির কাজটি সমাধান করতো। নিজ পণ্যের গুণাগুণ নিজেই বর্ণনা করতো। পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের এ প্রাচীন রূপটি আজও আমরা শহরের ফুটপাতে, গ্রামের হাট-বাজারে প্রত্যক্ষ করি। ধীরে ধীরে সাক্ষরতা শুরু হলো। মানুষ লেখা পড়া শিখলো। হাট-বাজার ছাপিয়ে দোকান ঘরের সৃষ্টি হলো। মানুষের মাঝে অল্প পয়সায় মানসম্মত পণ্য ক্রয়ের প্রবণতা তৈরি হলো। দোকানদার বা সেলস্ম্যানরা দোকানের সামনে পণ্য-দ্রব্যের ছবি এঁকে ক্রেতা সাধারণকে আকৃষ্ট করার নতুন পন্থা উদ্ভাবন করলো। ফলে সৃষ্টি হলো সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ডের আধুনিকতম রূপটি হলো ইয়া বড় বিলবোর্ড কিংবা ডিজিটাল ব্যানার। এরপর এক সময় দোকান মালিকরা দোকানের সামনে মানব ঘোষক রাখার পন্থা আবিষ্কার করলো। এ ঘোষকরা পণ্যের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে লোক জমায়েত করে পণ্য বিক্রি করতো। বিজ্ঞাপনের এ প্রাচীন ব্যবস্থাটি আজ আধুনিকতার মোড়কে ভ্রাম্যমান প্রতিনিধির রূপ পরিগ্রহ করেছে। এতে ব্যবহৃত হচ্ছেন বিনোদন জগতের মডেল তারকারা(?)। এরপর এক সময় ছাপাখানা আবিষ্কার হয়। এতে বিজ্ঞাপন জগতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। পণ্য বিজ্ঞাপনের জন্য সৃষ্টি হয় পোস্টার ব্যবস্থা। দেয়ালে দেয়ালে পণ্যচিত্র এবং পণ্যতথ্য সম্বলিত পোস্টার সেটে পণ্য প্রচারণার ব্যবস্থাটি এক সময় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। বিজ্ঞাপনের প্রাচীন এ ব্যবস্থাটি আজো সমতালে অক্ষুণ্ন রয়েছে। ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কক্সটন নামের জনৈক ব্যক্তি সর্বপ্রথম কতগুলো ধর্মীয় গ্রন্থের অনুরূপ পোস্টার তৈরি করে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের তথ্য মতে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সনের দিকে প্রাচীন মিসরে পোস্টার ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। পোস্টার ব্যবস্থার আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয় ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে লিথোগ্রাফি (lithography– পাথর, দস্তা বা এ্যালুমিনিয়ামের পাত ব্যবহার করে ছাপানোর পদ্ধতি বিশেষ) আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। বস্তুত বিজ্ঞাপনের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রাচীন মিসরীয়রা পণ্যের বিক্রয়তথ্য বিজ্ঞাপনে এবং ওয়ালপোস্টার বিনির্মাণে প্যাপিরাস (papyrus–দীর্ঘ জলজ উদ্ভিদ বা নল-খাগড়া থেকে তৈরি এক ধরনের কাগজ) ব্যবহার করতো। প্রাচীন আরব এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত রোমান ছোট্ট নগরী পম্পেই-তেও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, বেশ প্রাচীন যুগেও বিজ্ঞাপনের প্রচলন ছিল। তবে আধুনিক বিজ্ঞাপনের জনক হিসেবে থমাস জে. ব্যারাট (thomas j. barratt)-এর নাম উল্লেখ করা হয়। থিবস নগরের পুরনো পুঁথি ইতিহাস পাঠে জানা যায়, সেখানে একদা পালিয়ে যাওয়া এক ক্রীতদাসকে ধরতে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। ধারণা করা হয়, সে থেকেই বিজ্ঞাপনের প্রচলন শুরু হয়। খ্রিস্টীয় ১৬০০ শতকে ইংল্যান্ডে তথ্য ছড়িয়ে দেয়ার সমন্বিত উদ্যোগ প্রথম পরিলক্ষিত হয়। সেকালে সেন্টপলসের নির্দিষ্ট জায়গায় প্রাচীরপত্র দেয়া হতো। পরে ক্রমান্বয়ে তার পরিধি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তবে সে সবই ছিল ব্যক্তিগত স্তরের কেনাবেচা সংক্রান্ত। বর্তমান বিজ্ঞাপন জগতে যাকে আমরা শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন হিসেবে অবহিত করে থাকি। ১৬০০ শতকের শেষ দিকে সংবাদপত্রের উল্লেখযোগ্য উন্নতির ফলে বিজ্ঞাপনেরও স্থায়ী এবং মজবুত একটি জায়গা হয়ে যায় অর্থনীতির বিস্তৃত অঙ্গনে। শিল্পবিপ্লব এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বিজ্ঞাপন জগতে বিপুল সম্ভাবনা ও পরিবর্তন এনে দেয়। সে সময় করাধিক্যের ফলে বিজ্ঞাপনের বিকাশধারা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত হয়ে উঠেনি। ১৮৫৩ ও ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে দু' দফায় যাবতীয় কর প্রত্যাহার করে নেয়া হলে সংবাদপত্রের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে বিজ্ঞাপনেরও রমরমা বাণিজ্যের সূচনা হয়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রথম বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হয়। বিজ্ঞাপনের আধুনিক যুগ মূলত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বিকাশের সাথে সাথেই সূচিত হয়। আধুনিক ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো, উৎপাদন এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন। উৎপাদন বা সরবরাহ বজায় রাখতে হলে পণ্যের এক আকর্ষণীয় বাজার চাই। বিজ্ঞাপন সে বাজারে পণ্যকে বিক্রয়যোগ্য হিসেবে প্রচার করে। উৎপাদক ও ক্রেতার মাঝে এক সেতুবন্ধ গড়ে তোলে এ বিজ্ঞাপন। তাই উৎপাদকেরা তাদের পণ্যের বিক্রি বাড়ানোর জন্য নিরন্তর বিজ্ঞাপন প্রচার করতে থাকে। ফলে গড়ে ওঠে বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র ও এজেন্সি। সংবাদপত্রগুলো তাদের নিজস্ব বিজ্ঞাপন দপ্তর খুলে বসে। গড়ে উঠে বিজ্ঞাপন দাতাদের স্বার্থ রক্ষার সংগঠনও। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সংবাদপত্রের বিক্রি সংখ্যার তথ্য পেতে অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশন তৈরি হলে বিজ্ঞাপনের স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্বের কাল শুরু হয়।

অর্থনীতির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে বিজ্ঞাপনের উপস্থিতি ও অস্তিত্ব বজায় থাকার কাজটিও সম্পন্ন হয়। মুদ্রণ মাধ্যম ছাপিয়ে প্রথমে রেডিও পরে টেলিভিশন বিজ্ঞাপন-মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। আজ মোবাইল, ইন্টারনেটও বিজ্ঞাপনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের ব্যাপকতা আজ প্রচারমাধ্যমেরও অস্তিত্বের নিয়ন্ত্রক। উচ্চবিত্তদের জীবন প্রণালীও এখন বিজ্ঞাপনের কল্যাণে সম্পাদিত হয়। এক সকাল থেকে আরেক সকাল অবধি সমস্ত গণমাধ্যম জুড়ে থাকে বিজ্ঞাপনের শাসন। উদ্দেশ্য একটিই; ব্যক্তির মনছবিতে দখলস্বত্ব প্রতিষ্ঠা। মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতায়, সত্য-মিথ্যায়, স্বাদ-বিস্বাদে জীবন ও মূল্যবোধের উপর সাংস্কৃতিক-অপসাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারে বিজ্ঞাপন আমাদের অস্তিত্বকে অক্টোপাশের মতো আটকে রাখে সারাক্ষণ।

বিজ্ঞাপনের ক্রমধারা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশ কেন্দ্রিক বিজ্ঞাপনের পর্যালোচনায় প্রথমেই ব্রিটিশ আমলের কথা উঠে আসে। সে সময় দু'টি বিজ্ঞাপন ছিল বেশ অভিনব এবং নতুন। তার একটি হলো চা পানের বিজ্ঞাপন আর অপরটি হলো ম্যালেরিয়া রোগের ওষুধি পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত কুইনাইনের বিজ্ঞাপন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের মালনিছড়ায় বাণিজ্যিকভাবে চা বাগান প্রতিষ্ঠা করে বৃটিশ সরকার। দেশের মানুষের মধ্যে চা পানের অভ্যাস গড়ে তুলতে ব্রিটিশরা সে সময় চায়ের বিজ্ঞাপন দেয়া শুরু করে। এ দেশের মানুষ পানীয় বলতে যা বুঝতো তা হলো দেশী গরুর খাঁটি দুধ। অত্যন্ত পুষ্টিকর দুধের বিপরীতে তারা চা পান করতে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করতো না। তাই ব্রিটিশরা বিজনেস স্ট্র্যাটেজি হিসেবে এ দেশের মানুষকে ফ্রি চা পান করানোর পন্থা উদ্ভাবন করে। এতেও তারা কাঙ্ক্ষিত সফলতার দারে পৌঁছুতে সক্ষম হচ্ছিল না। ব্রিটিশরা ভেবে দেখলো, দুধ হলো এ দেশের মানুষের অমীয় সুধা। তাই চায়ের কাটতি বাড়াতে তাতে দুগ্ধসুধার সংমিশ্রণ ঘটাও। ব্যস ব্রিটিশদের এ উদ্ভাবনী শক্তি তাদের চা বাণিজ্যে বিপুল সফলতা এনে দেয়। তাই দেখা যায়, ভারতবর্ষ বাদে বিশ্বের অন্য কোথাও দুধ-চায়ের প্রচলন নেই বললেই চলে। ব্রিটিশদের চা প্রচারণার কাজটি তাদের উদ্ভাবিত বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা বেশ সহজতর করে তুলেছিল। তখন চা'কে জনপ্রিয় করে তুলতে রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট, স্টিমারঘাটসহ পাবলিক প্লেসে বিজ্ঞাপন-ফলক লিখে প্রচার করা হতো। এমন একটি বিজ্ঞাপন কালের সাক্ষী হয়ে আজো শ্রীমঙ্গল চা জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। আদমজি জুট মিলের দেয়ালের গায়েও এমন একটি বিজ্ঞাপনের দেখা মিলে।

বস্তুত আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বে এ দেশে বিজ্ঞাপন শিল্পের অভিযাত্রা শুরু হয়। ৫০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকাকেন্দ্রিক প্রথম বিজ্ঞাপন শিল্পের চর্চা শুরু হয়। কিন্তু ঢাকা তখনো এ শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল না। ঢাকার বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন তখন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 'নিয়ন সাইন' করিয়ে আনা হতো। মূলত দেশ বিভাগের পরই ঢাকা বিজ্ঞাপন ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। আশির দশকে এ দেশে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানী গড়ে উঠে। শুরু হয় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পণ্যের সাথে তুমুল যুদ্ধ। সে সাথে বিজ্ঞাপন শিল্পও ক্রমান্বয়ে প্রসারিত এবং বৈচিত্র্যময় হতে শুরু করে।

ঢাকা কেন্দ্রিক বিজ্ঞাপন শিল্পের ইতিহাসটা নিয়ে পর্যালোচনা করা হলে তার উপাখ্যানটা দাঁড়ায় নিম্নরূপ-

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গুলাম মহিউদ্দিন 'গ্রিন ওয়েজ পাবলিসিটি' নামের একটি বিজ্ঞাপন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটিই সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপনী সংস্থা। ১৯৫৪ মতান্তরে ৫৫ খ্রিস্টাব্দে সালাম কবির প্রতিষ্ঠা করেন 'ইস্টল্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানি'। ১৯৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে যাত্রা শুরু করে বিজ্ঞাপনী সংস্থা কোহিনূর। ১৯৬০ এর দশকের শুরুতে শরফুদ্দিন আহমেদ, শের আলী রামজি ও ইফতেখারুল আলম মিলে প্রতিষ্ঠা করেন 'স্টার অ্যাডভার্টাইজিং'। এ সময় 'লিভার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিস' এবং 'ডিজেকিমার'ও এ দেশে তাদের যাত্রা শুরু করে। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে শরফুদ্দিন আহমেদ চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'নবংকুর অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড'। এ সময় গুলাম মহিউদ্দিন বিজ্ঞাপন জগতে নতুনত্ব এবং ভিন্ন ধারা সৃষ্টিতে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন 'চ্যাম্পিয়ন নিয়ন সাইন'। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের 'এশিয়াটিক অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড' ঢাকায় 'ইস্ট এশিয়াটিক অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড' নামে তাদের শাখা অফিস চালু করে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'এশিয়াটিক মার্কেটিং কমিউনিকেশনস লিমিটেড'। এরপর দু' এক বছরের ব্যবধানে রেজা আলী প্রতিষ্ঠা করেন 'বিটবি'। ১৯৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লতিফুর রহমান বিজ্ঞাপন শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে প্রতিষ্ঠা করেন 'ইন্টারস্পিড'। দেশ স্বাধীনের পর দেশী উদ্যোক্তারা নতুন শক্তি ও সাহসে উৎসাহিত হয়ে নব উদ্যমে বিজ্ঞাপন শিল্পে বিনিয়োগ শুরু করেন। এ সময় বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানের কিছু বিজ্ঞাপনী সংস্থাকে অধিগ্রহণ করে। এর মধ্যে 'কোহিনূর' নামক বিজ্ঞাপন সংস্থা উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার পর শরফুদ্দিন আহমেদ কবি ফজল শাহাবুদ্দিন এবং অভিনেতা হারুন রশিদকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'নান্দনিক অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড'। 'নান্দনিক'ই সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপন শিল্পে রঙিন দৃশ্যের ব্যবহার শুরু করে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে রশিদ আহমেদ প্রতিষ্ঠা করেন 'কারুকৃত'। ঢাকার বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে গ্রাফিক্স ডিজাইনের প্রচলনের কথা উঠতেই রশিদ আহমেদের নাম চলে আসে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাডকম' এর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আনিসুল হক 'অ্যাডবিজ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভার্টাইজিং' প্রতিষ্ঠা করেন। একই বছর বিজ্ঞাপনের পথকে আরো মসৃণ ও প্রাণবন্ত করতে হাজি আরশাদ আলী 'এলিট প্রিন্টিং প্যাকেজেস লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে অভিনেতা পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেন 'অ্যাডবেস্ট'। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে অভিনেতা আফজাল প্রতিষ্ঠা করেন 'মাত্রা'। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে মুনির আহমেদ খান ও জুলফিকার আহমেদ 'ইউনিট্রেন্ড' প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর আরো অনেক বিজ্ঞাপনী সংস্থার জন্ম হয়। নব্বইয়ের দশক থেকে বিজ্ঞাপন জগতে তুমুল পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময় বিজ্ঞানসম্মত বিজ্ঞাপন তৈরির ধারা শুরু হয়। সে সাথে বিজ্ঞাপন তৈরির পূর্বে মার্কেটিং রিয়েলাইজেশনের বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়। নতুন শতাব্দির শুরুতে বিজ্ঞাপন শিল্পে আমূল পরিবর্তন আসে। অনেক ব্যবসায়ী এ শিল্পে বিনিয়োগ করেন। পেশা হিসেবে বেছে নেন অনেকে। এক জরিপ মতে বর্তমানে বাংলাদেশে আনুমানিক ২৫০টিরও বেশি বিজ্ঞাপনী সংস্থা রয়েছে। এ সময় উদ্ভব

হয় আধুনিক প্রযুক্তিসম্মত নিত্যনতুন বিজ্ঞাপনী মাধ্যম। সব থেকে বেশি পরিবর্তন এসেছে বড় বড় বিলবোর্ডের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে। আশপাশে তাকালেই রাস্তা ও বিশাল অট্টালিকায় ইলেক্ট্রনিক বিলবোর্ড চোখে পড়ে। তবে ইন্টারনেট মিডিয়ার বিস্তৃতিতে টিভি বিজ্ঞাপনের বাজার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে বলে আভাস দিয়েছে বিশ্বের বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞাপনী সংস্থা। ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপনী সংস্থা 'জেনিথ অপটিমিডিয়া' এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'পাবলিসিস' এর পূর্বাভাস মতে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাপী মোট বিজ্ঞাপন ব্যয় ৫৩২০০ কোটি ডলারের ৪০.২ শতাংশ টিভি মিডিয়ায় খরচ করবেন বিজ্ঞাপন দাতারা। বর্তমানে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সেরা বিজ্ঞাপনী সংস্থার মর্যাদা পেয়েছে জাপানের 'ডেন্টসু' ও 'হাকুহুডো'। আর বিজ্ঞাপনে সেরা দশ দেশের মধ্যে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে জায়গা করে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও জাপান। তাদের অবস্থান যথাক্রমে পঞ্চম ও সপ্তম। এ ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্র। বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন শাখায় সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি হিসেবে 'কান লায়ন পুরস্কার' দেয়া হয়। পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলোর আনুষ্ঠানিক অবস্থান তালিকা বা অফিশিয়াল র‍্যাংকিং প্রকাশিত হয়। এ তালিকায় বর্তমানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে ব্রাজিল ও যুক্তরাজ্য। শীর্ষ দশে জায়গা না পেলেও এ তালিকার ১২ নম্বরে রয়েছে ভারত। এশিয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সেরা বিজ্ঞাপনী সংস্থার তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে আছে 'ওয়াইএন্ডআর বেইজিং', চতুর্থ স্থানে রয়েছে 'লিও বার্নেট সিডনি' এবং নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডভিত্তিক 'কলেনসো বিবিডিও' রয়েছে পঞ্চম স্থানে। সারা বিশ্বের সেরা বিজ্ঞাপনী সংস্থা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে লন্ডনের 'অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ বিবিডি'। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে 'ডেন্টসু'।

আজকাল ঢাকার পত্রপত্রিকা ও বেতার-টেলিভিশনে লক্ষ্য করা যায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিজ্ঞাপনেরই ছড়াছড়ি। পণ্য, চাকরি, নিলাম, জায়গা-জমি, ঘরবাড়ি, ক্রয়-বিক্রয়, বিদেশ যাত্রা, কৃতি ছাত্র-ছাত্রী, টেন্ডার নোটিশ, বিউটি পার্লার, ছাত্র পড়ানো, কোচিং সেন্টার, পাত্র-পাত্রী চাই, পত্রপত্রিকা প্রকাশনা, সিনেমা, প্রসাধনী, উকিল নোটিশ, স্বাস্থ্য, রোগ-ব্যধি, পরিবার পরিকল্পনা, শুভেচ্ছা, ভর্তি, ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনসহ আরো কত ধরনের বিজ্ঞাপন যে চোখে পড়ে তার কোনো পরিসংখ্যান নেই।

(উইকিপিডিয়া, বিভিন্ন দৈনিক (অনলাইন সংস্করণ), বিজ্ঞাপন বিষয়ক বিভিন্ন ব্লগ এবং ওয়েবসাইট, Principles of Marketing (10th Edition), Philip Kotler & Gary Armstrong, Pearson Prentice Hall, American Heritage Dictionary, Third edition, Version 3.6a)

ইসলামী বিধি নিষেধ এবং বিজ্ঞাপন

পূর্বের আলোচনায় বিজ্ঞাপনের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে একটি বিষয় ফুটে উঠেছে যে, বস্তুগতভাবে বিজ্ঞাপন কোনো অচ্ছুত কিংবা নিষিদ্ধ বিষয় নয়। রুচিগতভাবেই মানুষ তার কাছে রক্ষিত জিনিসটির কথা অন্যকে অবহিত করার প্রবণতা লালন করে এবং তাতে কোনো গুণাগুন থেকে থাকলে তাও অকপটে জানিয়ে দিতে আগ্রহ বোধ করে। চাই তা যেকোনো স্বার্থকে লালন করেই হোক? ইসলাম বিজ্ঞাপনের এ স্বাভাবিক প্রবাহকে গতিরোধ করতে চায় না। বর্তমানে প্রচলিত বিজ্ঞাপনগুলোর সাথে আধুনিকতার মোড়কে কিছু আনুষঙ্গিকতার প্রলেপ লেগেছে; যাতে ধর্মীয় বিধি নিষেধের ব্যাপারটি বেশ আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। মুসলিম দেশের অধিবাসী হিসেবে আমাদের জীবনধারা অবারিত এবং বন্ধনমুক্ত নয়। ওহীভিত্তিক একটি জীবনদর্শনকে ঘিরে আমাদের জীবনাচার আবর্তিত হতে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বাধ্য। সে হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতি থেকে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা অঙ্গনসহ তাবৎ বৈষয়িক ক্ষেত্রে আমাদের মাঝে একটি নৈতিকতা বোধ চির জাগরুক থাকা বিবেকের দাবিও বটে।

একটি বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন হয়ে উঠার পেছনে মানব শ্রেণীর অনেকগুলো স্তর পার হতে হয়। প্রথমত কোনো কোম্পানী তাদের সেবা বা পণ্য প্রচারণার নিমিত্ত একটি বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এরপর তারা কোনো বিজ্ঞাপন বিনির্মাণ সংস্থার দারস্থ হয়ে আর্থিক চুক্তিভিত্তিক একটি বিজ্ঞাপন তৈরি করে নেয়। এরপর এ বিজ্ঞাপনটি প্রচারণার জন্য তাদের কোনো মিডিয়ার সন্নিধান লাভ করতে হয়। এখানে অর্থের বিনিময়ে তাদের বিজ্ঞাপন প্রচারণার কাজটি সমাধা হয়। এ বিজ্ঞাপনটি মিডিয়ায় চুক্তিভিত্তিক নিয়মে প্রচারিত হচ্ছে কি না তা মনিটরিং করার জন্য আলাদা সংস্থা প্রস্তুত রয়েছে। কখনো কোম্পানীকে তাদের বিজ্ঞাপন প্রচারণার ব্যাপারটিকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য অ্যাড মনিটরিং এজেন্সির সাথে চুক্তি বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। সর্বশেষ বিজ্ঞাপনটি দর্শক, শ্রোতা, ভোক্তা, গ্রাহক, ক্লায়েন্ট যাই বলি–এদের সামনে পরিবেশিত হয়। তো একটি বিজ্ঞাপন যদি নীতি-নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হয়ে অনৈতিক এবং অবৈধতার স্তরে নেমে আসে তাহলে তা মানব শ্রেণীর অনেকগুলো পক্ষকে ছাপিয়ে দর্শক শ্রোতাদের বিশাল একটি জনগোষ্ঠিকে আক্রান্ত করবে। এমন কি নীতিমান, রক্ষণশীল, ধার্মিক শ্রেণী যারা তাদের জীবনটাকে একটু নিয়ন্ত্রিত করে সাজাতে আগ্রহ বোধ করে তারাও এ অনৈতিক বিজ্ঞাপনের বিষক্রিয়া থেকে পরিত্রাণ পেতে সক্ষম হন না। তো প্রচলিত বিজ্ঞাপনগুলোতে আমরা যেসব আপত্তিকর বিষয়গুলো লক্ষ্য করি তা হলো, ১. নিষিদ্ধ এবং আপত্তিকর ছবির রমরমা ব্যবহার ২. ভিনদেশী অপসংস্কৃতির উন্মাতাল আয়োজন ৩. বাকশিল্পের চতুর আয়োজনে সত্যিকার মিথ্যা প্রলাপ ৩. প্রচারণার বাতাবরণে সীমাহীন প্রতারণা ৪. যত্রতত্র বিজ্ঞাপন সাটার নামে সুস্থ জীবন ধারাকে ব্যহত করণ ৫. নাগরিক জীবনের সৌন্দর্যকে ধূলিম্লান করণ ৫. আদিরসের সুড়সুড়িতে উঠতি বয়সের তরুণ সমাজকে বিপথগামী করার পথকে সুগম করণ ৬. সড়ক দুর্ঘনাকে ত্বরান্বিত করণ ৭. নৈতিকতা বোধকে বিধ্বস্ত করে দেয়া ৮. স্বকীয় মূল্যবোধ এবং দেশপ্রেমের বিনাশ সাধন ৯. লাজহীনতার চরম অবক্ষয় ধারা সৃষ্টি করা ১০. পাপাচারের কন্টকাকীর্ণ পথকে মসৃণ এবং অবারিত করা ১১. আত্মপ্রশংসার লাগামহীন প্রচারণা ১২. ইসলামী আকীদা বিধ্বংসী বিষাক্ত প্রচারণা। ইসলামী বিধি নিষেধের দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞাপনের অনৈতিক এ শিরোনামগুলো নিয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা পর্ব তৈরির চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। **(অসমাপ্ত)**

লেখক : শিক্ষা সচিব, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বছিলা গার্ডেন সিটি, ঢাকা।

পানি নয়! মরীচিকা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... *অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)*

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-৮

১৪ই রমাযান, ১৪৩৬ হিজরী। রাত ১১ টায় লন্ডন থেকে এক ভাই ফোন করে বললেন, তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে দু'আয়ে ইউনুসের খতম পড়ছেন। সোয়া লাখ পূর্ণ হলে আমাকে জানাবেন– আমি যেন মুসল্লীদের নিয়ে দু'আ করে দেই।

এই ভাই সাহেব আমাকে সীমাহীন ভালোবাসেন। শুধু দীনের খাতিরে তিনি আমার পিতা-মাতা, ভাই-বেরাদর ও আমার গোটা পরিবারকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। ভালোবাসার টানে তিনি ছুটে গেছেন আমাদের গ্রামের বাড়িতে, আমাকেও নিয়ে গেছেন তার গ্রামের বাড়িতে। আমার সাথে কথা শুরু হলে তিনি অতীত-ভবিষ্যত ভুলে যেতেন। ভালোবাসার সম্মান দিতে গিয়ে তার অনেক কথা অনেক কাহিনী আমাকে সহস্রবার শুনতে হয়েছে। তিনি ভুলে যেতেন যে, কথাগুলো তিনি আমাকে বহুবার বলেছেন এবং আরও বহুবার বলার সুযোগ নেবেন। প্রায়ই দাবী করতেন যে, আমার পেছনে ইক্তিদা করার পর তিনি যে সূরার তিলাওয়াত আশা করেছেন আমি সে সূরা দ্বারাই নামায পড়িয়েছি। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করতেন যে, আমার সাথে তার আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যদি তার এ ভালোবাসা কবুল করেন তাহলে সেটা আমার জন্যেও নাজাতের উসীলা হয়ে যেতে পারে। তিনি আমার ব্যাপারে যেসব সুধারণা পোষণ করেন আল্লাহ তা'আলা যদি সেগুলো বাস্তব করে দেন তাহলে আমার দোজাহানের সাফল্যের জন্য আশা করি যথেষ্ট।

আমার সাথে পরিচয়ের পর থেকে প্রায় সব বিষয় আমার সাথে পরামর্শ নিয়ে করার চেষ্টা করতেন। আর যেখানে পরামর্শ মত চলতে অপারগ হতেন সেখানে অকপটে নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করতেন। সুন্দর তিলাওয়াতে কুরআন ও হাফেযে কুরআনের প্রতি তার দুর্বলতা আমাদের আলেম শ্রেণীর চেয়েও অনেক বেশি। নিজেও মোটামুটি তিলাওয়াত করতে পারেন। তার ধারণায় এক্ষেত্রে তিনি মসজিদে হারামের ইমাম আওয়াদ আলজুহানীর ভাবশিষ্য। ইন্টারনেটে যোগে জুহানীর সাথে এক দু'বার ই-মেইল আদান-প্রদানও করেছেন।

সংসার জীবনে ছিলেন যথেষ্ট সুখী মানুষ। স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে কোন সঙ্কট, বাদ-বিবাদ কখনো ছিল না। যদিও দীনদারীর বিবেচনায় ভাবী তার মত অতোটা অগ্রসর নয়। কিন্তু রক্ষণশীলা ও উদার। তার দীনী চেতনায় সহায়ক; প্রতিবন্ধক কখনো নয়। পরিপূর্ণ পর্দা করেন না; কিন্তু শালীন ও পর্দার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাদের তিনটি সন্তান। আগে পরে পুত্র ও মাঝে কন্যা। বড় ছেলে 'ও' লেভেলে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। এখন 'এ' লেভেল করছে। পরে ইংল্যান্ড গিয়ে ডাক্তারী পড়বে। মেয়ে সম্ভবত ধানমন্ডি জুনিয়র ল্যাবরেটরিতে পড়ে, ছোট ছেলে ম্যাপল লীফে। সন্তানরা মা-বাবার যথেষ্ট অনুগত। ছেলে-মেয়েকে স্কুল লাইনে পড়ালেও তরুণ প্রজন্মের অবাধ মেলামেশা মা-বাবার কারোই পছন্দ নয়। তাদের আশা তাদের শৈশব ও কৈশর যেমন নির্মল নিষ্পাপ ছিল তাদের সন্তানরাও এমনই হবে। কাজেই স্কুল-ঘর-কোচিং সেন্টার, এছাড়া অন্য কোন গন্তব্যের সুযোগ তাদেরকে দেয়া হয় না। এ তিন স্থানেও সন্তানদেরকে একা থাকতে দেয়া হয় না। মা অথবা বাবা ছায়ার মত সন্তানদের পাশে থাকেন, যেন তারা বর্তমান পরিবেশ দ্বারা আক্রান্ত না হয়।

বড় ছেলেটা পড়ালেখার ব্যস্ততায় দৈনিক এক পৃষ্ঠা কুরআন তিলাওয়াত কিংবা সময়মত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়েরও সুযোগ পায় না– বিষয়টা এক হিসেবে সুখেরও বটে। আর ছোটটা তো এখনো মেয়ে-ছেলের পার্থক্যও বোঝে না। কাজেই এদেরকে নিয়ে আপাতত কোন দুশ্চিন্তা নেই। চিন্তা হল মেয়েকে নিয়ে। কুদৃষ্টি পড়ার আগেই বাবা পরামর্শ দিচ্ছেন বোরকা পরতে। মেয়ে এখনই বোরকা পরবে না, তবে নিয়মিত স্কার্ফ পরে মাথা ঢেকে স্কুলে ও কোচিংয়ে যাবে এবং বড় হলে বোরকা পরবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। মায়ের ভোটটি মেয়ের পক্ষে পড়লে মেয়েই জয়ী হয়। মা ভাবলেন তিনি যেমন নেকাব ছাড়া বোরকা পরে মুখ খোলা রেখে চলাফেরা করেন, অথচ কখনো কেউ তাকে টিজ করে না, বাঁকা চোখে দেখে না। আধা বোরকার বরকতে কোন সমস্যা হয় না, তেমনি বোরকা ছাড়া শুধু হেড-স্কার্ফের বরকতে ইনশাআল্লাহ মেয়েরও কোন সমস্যা হবে না। তাছাড়া মায়েরই যখন মুখ ঢাকার বয়স হয়নি তখন মেয়ের দিল্লী তো হনুয দূর অস্ত।

এদিকে বাবার উৎকণ্ঠা বেড়েই চলছে। বাবা বলে কথা, দুচোখেই আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে দেখার ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যত পরিষ্কার দেখছেন না। বোরকা পরতে অসম্মতি। তাতেই তার দৃষ্টি চলে গেছে অনেক দূরে। দূরে ঝাপসা দেখা শুরু করেছেন। তারপরও হাল ছাড়েননি। সুযোগ পেলেই নসীহত করেন। মেয়ের আচরণবিধি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রথম প্রথম নসীহত শুনে মেয়ে বাবাকে খুব আশ্বস্ত করত যে, আমি অবশ্যই তোমার কথামত চলব। এখন আমার সাথীরা কেউ বোরকা পরে না, আমি পরলে আমাকে নিয়ে উপহাস করবে, হাইস্কুল শেষ করে কলেজে গেলেই আমি পূর্ণ পর্দা করব ইত্যাদি, ইত্যাদি। এসব শুনে বাবা সাময়িক আশ্বস্ত হতেন এবং আমার কাছে এসে দু'আ চাইতেন, যেন মেয়েটা তার কমিটমেন্ট ঠিক রাখে। আমি তাকে হতাশ না করলেও বিষয়টি অত্যন্ত জটিল বলে কিছুটা দুশ্চিন্তায় ফেলতাম। তিনি বলতেন, এখন কী করব ভাইজান! আমি তো যে ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি তা থেকে তো আর বের হয়ে আসতে পারব না। তাছাড়া আমাদের মত লোকদের পারিবারিক অবস্থা যা তাতে আমরা তো

এমন ফাঁদে পা দেওয়া ছাড়া কোন উপায়ও দেখি না। তবে আমার বিশ্বাস আপনাদের দু'আয় আমি জীবনে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবো না যেমন হতে হচ্ছে আর দশজন মেয়ের বাবাকে। বলতেন, আপনার আব্বা-আম্মাকেও বলবেন আমার পরিবার ও সন্তানদের দীনদারীর জন্য দু'আ করতে।

তিনি আমাদের দু'আয় যত আশা পোষণ করতেন আমরা কিন্তু আশা করতে পারতাম না। কারণ শরয়ী বিধান লঙ্ঘন ঠিক রেখে শুধু দু'আ করলে যদি কাজ হয়ে যেত তাহলে শরয়ী বিধানের কী মূল্য অবশিষ্ট থাকে। তবুও তার অনুরোধে দু'আ আমরা করেই যাচ্ছি।

কিছুদিন পর বললেন, ভাইজান! মেয়েটা কেমন যেন জেদি হয়ে যাচ্ছে। পড়াশোনা সবই ঠিক আছে, কিন্তু আমি বা তার মা কিছু বললেই রেগে যায়। ও কেমন যেন আমাদেরকে পাহারা দেয়, আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে চায়। স্কুল ও কোচিংয়ে কারো সঙ্গে যাওয়ায় আপত্তি তোলে। মাঝে মধ্যে বলে, তোমরা মরে গেলে আমার ভালো হয়, তোমরা আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছ। ওর এসব কথা ও আচরণে আমাদের মনে হয় তাকে কোন জিন আসর করছে। আপনার ভাবী বলল, আপনার কাছ থেকে পানি পড়া নিতে।

যা আশঙ্কা তাই সত্যি হল। তার মেয়েকে যে জিনে আসর করেছে সে জিন সকলের পরিচিত। কিন্তু তারা কেন বিভ্রান্তির শিকার হল তা আমি আজো বুঝি না। আমি পানি পড়া দিলাম ঠিক, কিন্তু জিন সম্পর্কেও সামান্য ধারণা দিলাম এবং বললাম, এমন জিন হলে কিন্তু পানি পড়ায় কোন কাজ হবে না।

তাদের বিভ্রান্তি একটুও কাটেনি। ওদিকে পানি শেষ কিন্তু জিনের আসর বেড়েই চলছে। তিনি এসে বললেন, কোন ভালো তদবীরকারী পরিচিত আছে কিনা? আমি এমন একজনের ফোন নাম্বার দিয়ে যোগাযোগ করতে বললাম, যিনি জিনের আসর না থাকা সত্ত্বেও আছে বলে পয়সা হাতিয়ে নেন না। তবে তুলারাশি দিয়ে পরীক্ষা করেন। একহাজার টাকা ফিস নেন এবং জিনের আসর না থাকলে সাফ সাফ জানিয়ে দেন। ফোন নাম্বার পেয়ে যোগাযোগ করে তিনি তার সাথে দেখা করলেন। একহাজার টাকা ফিস দিয়ে তুলারাশি দিয়ে পরীক্ষা করে তদবীরকারী জানালেন, কোন ধরনের জিনের আসর নেই।

এক পর্যায়ে তাদের জিনের বাস্তবতা বুঝতে আর বেগ পেতে হল না। সিদ্ধান্ত নিলেন, মেয়েকে আপাতত কিছুই বলবেন না এবং কৌশলে জিন আবিষ্কার করবেন। এ কারণে মাকে খেয়াল রাখতে বলে বাবা কিছুদিন মেয়ে থেকে দূরে থাকছেন। মেয়ে কিছুটা ছাড় অনুভব করলে এখন মায়ের জ্ঞাতসারেই জিনের সাথে ফোনে কথা বলে। স্কুলে বা কোচিংয়ে আসা-যাওয়ার পথে মা সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও টা-টা বিনিময় করে। এভাবে মায়ের কাছে জিন আবিষ্কৃত হয়ে যায়। মায়ের সূত্রে পরে বাবাও অবগত হন।

প্রিয় পাঠক! আপনি হয়ত বাবার আগেই বুঝে নিয়েছেন যে, জিনটি কে? অনেক বাবাই আজ নিজ ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে এ ধরনের জিন-ভূতের আসরকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিয়েছেন। বরং একটি শ্রেণী তো সন্তানদেরকে এক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়ে থাকেন। কিন্তু আমার ভাইজান এ সঙ্গকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। যে কারণে তিনি সে জিনের বাবার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং নিজ সন্তানকে তার মেয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাত ও কথা-বার্তা বলতে নিষেধাজ্ঞার অনুরোধ জানান। কিন্তু জিনের বাবা ছিলেন আরও বড় মাপের জিন! মেয়ের বাবার অনুরোধের পিঠে তিনি বললেন, এটা ওদের নিজস্ব ব্যাপার, এ ব্যাপারে আমরা নাক গলানোর প্রয়োজন বোধ করি না। প্রয়োজনে আপনি আপনার মেয়েকে সামলান।

এ পর্যায়ে ভাইজান আমার কাছে এসে জিনের পরিভাষা পরিবর্তন করে বললেন, ভাইজান! এমন কোন তদবীর কি নেই যার দ্বারা মেয়েকে এ ছেলের থেকে নিরুৎসাহ করা যায়? বললাম, রোগী যদি তদবীর গ্রহণে আগ্রহী হয় তাহলে তো অনেক তদবীরই আছে। কিন্তু এখানে রোগী তো নিজেকে রোগাক্রান্ত মানতে রাজী নয়। তাহলে তদবীরে কি কাজ হবে? তিনি বললেন, কেন, প্রায়ই তো শুনি তদবীরের মাধ্যমে একজন আরেকজনকে পাগল করে দেয়। বিভিন্ন রকমের ক্ষতিসাধন করে, তাহলে পাগলকে ভালো করতে পারবে না কেন? বললাম, গ্রাম্য প্রবাদ আছে, 'শয়তানের বাতি বেশি জ্বলে'। সে হিসেবে এ সকল তদবীর শয়তানী কাজেই দ্রুত কাজ করে। কিন্তু ভালো কাজে কার্যকর কম হয়। তারপরও কারো মাধ্যমে এমন তদবীরকারীর সন্ধান পেলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আমাকে দু'আ করার দায়িত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখুন। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করলেন। আমার সাথে দেখা হলেই দু'আ চাইতেন এবং বিষয়টা কাউকে না জানাতে অনুরোধ করতেন। পাশাপাশি তদবীরের নিত্যনতুন কারগুজারী শুনাতেন। কখনো বলতেন, কিছুটা ফায়দা হচ্ছে, কখনো বলতেন, নাহ্ কোন কাজ হচ্ছে না।

কিছুদিন পর একটা বিদেশী নাম্বার রিসিভ করে শুনি ভাইজানের গলা। ভাইজান পূর্ব থেকেই দ্বৈত নাগরিকত্বের ধারক ছিলেন। ইটালী ও বাংলাদেশ দু দেশেরই পাসপোর্ট ছিল তার গোটা পরিবারের। সুতরাং ইউরোপ যেতে হলে টিকিট সংগ্রহ করা ছাড়া ভিসার কোন ঝামেলা ছিল না তার পরিবারের ছোট-বড় কারোই। ফোনে জানালেন যে, তিনি গোটা পরিবারসহ লন্ডনে চলে গেছেন এবং সেখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিয়মিত বসবাস শুরু করেছেন। সন্তানদেরকে ওখানে ভর্তি করে দিয়েছেন। লম্পট ছেলেটা থেকে মেয়ের সম্পর্কটা ছিন্ন করার মানসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদেরকে ছেড়ে লন্ডনে পাড়ি জমিয়েছেন। বললেন, ওখানে যারা ভালো থাকতে চায় তাদের ভালো থাকা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক সহজ। জিজ্ঞেস করলাম, তো মেয়ের খবর কী? বললেন, এখন শুধু ইন্টারনেট ফোনে কথা-বার্তা বলে। একেবারে তো আর সব ছিনিয়ে নেয়া যায় না। দু'আ করেন, যখন সামনা সামনি হতে পারছে না, আশা করি কথা-বার্তায় তেমন কিছু হবে না।

কিছুদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তিনি আবার ফোন দিলেন। বললেন, ভাইজান! মেয়েটা তো নামায-রোযা সব ছেড়ে দিচ্ছে। আগে তো এসবের প্রতি গাফলতি করলে বকাঝকা করতাম। এখন তো তাও করতে পারি না। কারণ এখানে সন্তানদের বকা দেয়া, ধমক দেয়া আইনত নিষেধ। চড়-থাপ্পড়ের তো প্রশ্নই আসে না। ছেলেরা তো মা-শাআল্লাহ রোযা-নামায কিছু করছে। এমনকি নাবালেগ ছেলেটাও কোন রোযা ভাঙছে না। কিন্তু মেয়েতো এসব ক্ষেত্রে আমাদের কোন কথাই আমলে নিচ্ছে না। বরং ঐ শয়তানের পরামর্শ মতই সব করছে। এখন তো আল্লাহর দরবারে দু'আ করা ছাড়া আর কোন করণীয় খুঁজে পাচ্ছি না। কাজেই আমি এবং আপনার ভাবী দু'জনে মিলে দু'আয়ে ইউনুসের খতম শুরু করেছি। সোয়ালক্ষ পূর্ণ হলে আপনি একটু বখশে দিবেন। যেন আমার কলিজার টুকরা পরকালে

জাহান্নামে দগ্ধ না হয়। এ প্রস্তাবে আমার অসম্মতির কোন সুযোগ নেই। কিন্তু আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, এ দু'আর দ্বারা যদি তার মেয়ের জীবনে পরিবর্তন সাধিত না হয় তাহলে তার পরিণতি কী হবে? আমার ভাইজান কি এ ছেলেকে জামাই হিসেবে মেনে নিবেন? মোবাইল বা স্কাইপির মাধ্যমে বিবাহ করিয়ে ছেলেকে লন্ডনে নিয়ে যেতে বাধ্য হবেন? শেষমেষ যদি তাই করতে হয় তাহলে আগে এত কসরত করে কী লাভ হল? ছেলের বাবার মত তিনিও তো এটাকে মেয়ের নিজস্ব ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে পারতেন। অতঃপর দু'জনে হয় লীভটুগেদার (বিবাহ বিহীন একত্রে বসবাস) করত কিংবা কোর্ট ম্যারেজ করে নিত। পরে উভয় পক্ষের বাবা-মা তাদেরকে বিবাহোত্তর সংবর্ধনা দিত। এ সংবর্ধনার সুফল তারা কতদিন ভোগ করবে সেটা তাদের উপরই ছেড়ে দিত।

আমার ভাইজান এতটা আধুনিক নয় বলে এ পথে যাননি। কিন্তু এ পথ ছাড়া কি তার কোন বিকল্প পথ আছে? এ পথের কথা চিন্তা করে তিনি যে মানসিক যন্ত্রণায় আছেন আর চেষ্টা করে যাচ্ছেন পরকালে হয়ত তিনি এর বিনিময় পাবেন। কিন্তু সন্তান যদি ফিরে না আসে তাহলে তার পরকালের কী দশা হবে? পরকালে বিশ্বাসী বাবা-মায়ের এ চিন্তায় ঘুম হারাম হয়ে যাওয়াটা ঈমানের দাবী। লিভটুগেদার মানে পশুত্বের জীবন। তাহলে যাদের সন্তান লীভটুগেদার করে তাদের বাবা-মায়ের মানুষ হওয়ার স্বার্থকতা কোথায়? মানুষের ঘরে পশু জন্ম নিলে মানুষের মর্যাদা বাড়ল, না কি পশুর? আর ঐ পশুদের পরবর্তী প্রজন্মই তো হয় সমকামী। অথচ চতুষ্পদ জন্তুও সমকামী জন্ম দেয় না। তাহলে দ্বি-পদ মানুষ পশু হয়ে গেলে কত খারাপ পশুতে পরিণত হয়, ভেবে দেখার বিষয়। অবাধ মেলামেশায় অভ্যস্ত ছেলে-মেয়েদের বাবা-মায়েরা চিন্তা করে দেখুক তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এ পাশবিক পরিণতি হতে তারা কীভাবে রক্ষা করবে। ইসলামী শরীয়তে মানবতার গ্যারান্টি আছে। কিন্তু কোন বাবা-মা নিজ সন্তানকে মানুষ দেখতে চাইলে সে চিন্তা গোড়া থেকেই করতে হবে। ভুল পথে চলতে লাগলে জানামাত্রই সাহসের সাথে বিপরীত দিকে হেঁটে গোড়ায় চলে আসতে হবে। এক্ষেত্রে যারা ইতস্তত করবে ও ভীরুতার পরিচয় দিবে, মূল পথ থেকে তাদের দূরত্ব বাড়তেই থাকবে। পরবর্তীতে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে পরকালে সন্তানদেরকে জাহান্নামে রেখে একা জান্নাতে যেতে হবে কিংবা সন্তানেরা টেনে হিঁচড়ে বাবা-মাকেও জাহান্নামে নিয়ে যাবে। জাহান্নাম কি কোন সাধারণ অশান্তির স্থান! সে তো نَارٌ حَامِيَةٌ (তপ্ত আগুন)। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এমন কুপরিণতি হতে রক্ষা করুন। আমীন।

আবূ তামীম

(২৩ পৃষ্ঠার পর, হযরত আদম আ.)

যমীনে অবতরণের প্রথম আদেশ যদিও শাস্তিমূলক ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে যখন আদম আ. ক্ষমাপ্রাপ্ত হলেন। তখন ভিন্ন হিকমতকে সামনে রেখে পৃথিবীতে প্রেরণের আদেশ বহাল রাখা হল। এখন তিনি পৃথিবীতে এলেন আল্লাহর খলীফা হিসেবে (শাস্তি স্বরূপ নয়)। (মা'আরিফুল কুরআন [সূরা বাকারা- ৩৯])

ইসমতে আম্বিয়া তথা নবীগণ মা'সূম হওয়া প্রসঙ্গ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল, হযরত আম্বিয়া আ. সব ধরনের সগীরা ও কবীরা গুনাহ থেকে মা'সূম (নিষ্পাপ)। ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها.

অর্থ : ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতানুযায়ী অধিকাংশ ফুকাহাদের মতে আম্বিয়া আ. কবীরা-সগীরা সব ধরনের গুনাহ থেকে নিষ্পাপ। (তাফসীরে কুরতুবী [সূরা বাকারা- ৩৫])

এ আকীদার ভিত্তিতে হযরত আদম ও হাওয়া আ. কর্তৃক নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করার উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তারা কি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করে গুনাহে লিপ্ত হলেন?

হযরত আদম আ. ছাড়াও কোন কোন নবীর ক্ষেত্রে এমন দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। বাহ্যিকভাবে যাতে মনে হয় যে, আদম আ. গুনাহ করেছেন।

এ ধরনের ঘটনার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উল্লিখিত আকীদায় বিশ্বাসী হয়ে ইমাম কুরতুবী রহ. এর এই মৌলিক কথাটি সবিশেষ স্বরণযোগ্য। তিনি বলেন,

وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور وعلى جهة الخطأ والنسيان أوتأويل دعا إلى ذلك فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم وعلو أقدارهم إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة قال وهذا هو الحق ولقد أحسن الجنيد حيث قال حسنات الأبرار سيئات المقربين.

অর্থ : আম্বিয়া আ. থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত ঐ সকল ঘটনাবলী (যা বাহ্যিকভাবে গুনাহ মনে হয়) মূলত বুঝার ভুল ও বিস্মৃতি বা এ জাতীয় কোন কারণে হয়েছে। সাধারণত মানুষের জন্য তা নেকীর কাজ হলেও অধিক নৈকট্যশীল হওয়ার কারণে আম্বিয়া আ. এর ক্ষেত্রে এটাকেও গুনাহ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা অনেক ক্ষেত্রে নৈকট্যশীল মন্ত্রীকে বাদশাহ এমন কাজের জন্য দণ্ড দেন, যে কাজের জন্য কখনো সহিসকে পুরস্কৃত করে থাকেন। এ কারণেই অন্যান্য নবীরা কিয়ামতের ময়দানে সুপারিশ করতে ভয় পাবেন। (ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,) এ ব্যাখাটিই সঠিক ব্যাখ্যা। এ মর্মে জুনাইদ বাগদাদী রহ. এর কথাটি সত্যিই প্রশংসাযোগ্য– '(অনেক ক্ষেত্রে) নেককার লোকদের ভালো কাজও নৈকট্য প্রাপ্তদের জন্য অন্যায় কাজরূপে বিবেচিত হয়। (তাফসীরে কুরতুবী [সূরা ত্বোয়া-হা- ১২১])

হযরত আদম আ.ও জেনে বুঝে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেননি। বরং নিষেধের ক্ষেত্র নির্ধারণে তিনি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। আদম আ. কে নিষেধ করা হয়েছিল একটি গাছের প্রতি লক্ষ্য করে। উদ্দেশ্য ছিল 'এ জাতীয় সকল গাছ থেকে নিষেধ করা'। সেজন্য শয়তানের প্ররোচনায় তিনি অন্য গাছ থেকে ফল খেয়েছিলেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে মা'আরিফুল কুরআন (সূরা বাকারা- ৩৬) নামক তাফসীর গ্রন্থে।

উল্লিখিত ব্যাখ্যার কারণেই সুপ্রসিদ্ধ মুফাসসির ইমাম কুরতুবী রহ. হযরত আদম আ. সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াত وعصى آدم ربه فغوى এর غوى এর ব্যাখ্যায় বলেন,

ففسد عيشه بنزول إلى الدنيا ، والغي الفساد ؛ وهو تأويل حسن.

অর্থ : (ভুলবশত আল্লাহর আদেশ অমান্যের দরুণ) জান্নাতের কষ্টহীন জীবন থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন এবং দুনিয়াতে কষ্টকর জীবনের সম্মুখীন হলেন। (তাফসীরে কুরতুবী [সূরা ত্বোয়া-হা- ১২১])

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, উলূমুল হাদীস বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

মোকছুদুল মো'মিনীন

গ্রন্থ পরিচিতি

মাওলানা সাইদুয্‌যামান

সাধারণ সমাজে প্রায় সর্বজনগৃহিত একটি বই *মোকছুদুল মো'মিনীন*। বছর বছর ধরে সবাই এ বই পড়ছে। এত শত বইয়ের মাঝে কার দিকনির্দেশনায় এ বইয়ের চয়ন? একটা কৌতুহলী প্রশ্ন। আমাদের দেশে এ বইয়ের একই প্রচ্ছদ ও নামে সামান্য সংযোজনসহ কয়েকটি বই পাওয়া যায়। একটার নাম *মোকছুদুল মো'মিনীন বা বেহেশতের কুঞ্জি*, লেখক, মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান। অন্যটার নাম *সহীহ মাকসূদুল মুমিনীন বা বেহেশতের চাবি*, লেখক, গোলাম মোসতফা। নামের বৈচিত্র থাকলেও বিষয়বস্তুতে প্রায় সব এক।

***মোকছুদুল মো'মিনীন* গ্রন্থ বিশ্লেষণ**

বইটি জীবন বিধান ও জীবন গঠন সম্পর্কে লেখা। ঈমান-আকাইদ, নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত, জানাযা-মীরাস, নির্বাচিত সূরা ও দু'আ, আদব-আখলাক, তা'বীরে খাব ও তদবীর, নবী ও ওলীদের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত নিয়ে এ বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! মনের ভাব প্রকাশের স্বতঃসিদ্ধ একটি মূলনীতি হল, কথার দ্বারা কারো ভুল বোঝার আশঙ্কা না থাকা। এটা সাধারণত লেখকদের অবহেলা কিংবা অজ্ঞতার কারণে হয়ে থাকে। এর একটি কারণ হল, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি বেশী জোর দেয়া। *মোকছুদুল মো'মিনীন*-এর ব্যাপারে এ আপত্তিটি উল্লেখযোগ্য। যেমন, নিয়ত প্রসঙ্গ। নিয়তের আভিধানিক অর্থ হল, ইচ্ছা করা। মাসআলা হল, মনে মনে ইচ্ছা করার দ্বারাই নিয়ত হয়ে যায়। কিন্তু মৌখিক নিয়তের কথা এজন্য বলা হয়, যেন সে ইবাদতে পরিপূর্ণ মনোযোগী হতে পারে। কারণ মুখে বলার দ্বারা বিক্ষিপ্ত মনকে স্থির করা সহজ। (ফাতাওয়া শামী ১/৮০)

কোন ইবাদত বা নেক কাজ করতে গেলে নিয়তের বিষয়ে প্রশ্ন করা যথার্থ। কারণ, আমলের সওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু শরীয়তে সর্বত্র গতানুগতিক নিয়ত কখনই কাম্য নয়। *মোকছুদুল মো'মিনীনে* সব ধরনের ইবাদত ও তার মাধ্যম যেমন, উজু গোসল ইত্যাদিতে গৎবাঁধা আরবী নিয়তের এতটাই চর্চা হয়েছে, যার ফলে মানুষ আজ সকল বিষয়ে আরবী নিয়তের খোঁজে থাকে। কেউ ফজর কেউ আসর, কেউ তাহাজ্জুদ কেউ বা ইশরাক, কখনো শবে বরাত তো কখনো শবে কদরের নিয়ত নিয়ে পেরেশান।

আজ থেকে প্রায় ৬/৭ বছর আগে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম থানার বদরপুর নামক গ্রামের এক মসজিদে সফরে ছিলাম। পাড়ার দীনদার নামে খ্যাত মসজিদের মুতাওয়াল্লী মাস্টার সাহেব, তার সাত বছর বয়সী নাতি দাদার কাছে পড়ে, কতকিছু শেখে। আমাদের এক সাথীকে সে শোনাচ্ছে। হঠাৎ সে বলল, আমি গোসল করতে যাব। ঐ মাওলানা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, গোসলের সুন্নাত জানো? সে হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়ে বলতে শুরু করলো, এক নম্বরে নিয়ত করবো। নিয়ত কি তা জানতে চাইলে সে বলল, نويت ان اغتسل من الجنابة অর্থাৎ আমি (জানাবাত) ফরজ গোসলের নিয়ত করছি। আমরা শুনে তাজ্জব হয়ে গেলাম। এত ছোট বাচ্চা! সে ফরজ গোসলই বা কি বুঝে? নিয়ত তো দূরের কথা। তাকে তো শেখানো উচিত ছিল যে 'আমি পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করছি'। বস্তুতঃ *মোকছুদুল মুমিনীন* বা এ জাতীয় বইয়ের অদ্ভুত বর্ণনায় মানুষ আরবী নিয়তকে আবশ্যক মনে করছে যা কখনোই কাম্য ছিল না।

বারো চাঁদের ফযীলত

এ বইয়ের আকর্ষণীয় অধ্যায়ের একটি হল বারো চাঁদের ফযীলত ও তার আমল (পৃ.১৫৮-১৬০)। এখানে কুরআন-সুন্নাহর দ্বারা প্রমাণিত ফযীলতের দিবস বা রাত, কিংবা মনগড়া কিছু দিবস যেমন, চাহারশোম্বা, দোয়াযদহম ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রকার আমল বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনাভঙ্গিটা এ রকম, অমুক রাতে যে ব্যক্তি এত রাকাআত নামায পড়বে, যার প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে দশ বার সূরা ইখলাস পড়বে তার ১ বৎসরের গুনাহ মাফ হবে। এরূপ বহু বর্ণনা *মোকছুদুল মুমিনীনে* উল্লেখ আছে। চমৎকার ব্যাপার হল, এখানে তারা কোন প্রকার উদ্ধৃতি উল্লেখ করেননি। এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বর্ণনাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা অসম্ভব। তবে এ বিষয়ের মৌলিক কিছু কথা জানলে আমরা এ বর্ণনাগুলোর সামগ্রিক মান জানতে পারব।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. স্বীয় কিতাব المنار المنيف في الصحيح والضعيف (পৃ. ৯৫)-এ জাল হাদীস যাচাইয়ের কিছু নিদর্শন উল্লেখ করে লিখেন, ومنها أحاديث صلوات الأيام والليالي জাল হাদীসের নিদর্শনাবলীর একটি হল, বিভিন্ন দিবস ও রাত্রির নির্ধারিত নামায। অর্থাৎ তিনি এ জাতীয় বর্ণনাকে অগ্রহণযোগ্য বলতে চাচ্ছেন।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী রহ. রচিত الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة নামক কিতাবের ৫৮-১২৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এ ধরণের বর্ণনার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তৎসঙ্গে এ মর্মে উলামায়ে কেরামের মত ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও যুক্ত করেছেন, যার সারাংশ হল,

(১) এ ধরনের বর্ণনা বিভিন্ন সূফী-সাধকদের দেয়া বর্ণনা। রেওয়ায়েত গ্রহণ ও বর্জনের শাস্ত্রীয় যোগ্যতা না থাকার ফলে, দীনের জন্য লাভজনক মনে করে তারা তা প্রচার করেছেন।

(২) এই বর্ণনাগুলোর সূত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুক্ত নয়; বরং তা কোন সূফী বুযুর্গ পর্যন্তই শেষ হয়ে যায়। যিনি হয়ত তার মুরিদগণকে তরবিয়ত করার জন্য বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তিতে কেউ তা হাদীস হিসেবে বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন।

(৩) এ ধরনের আমলে অভ্যস্ত লোকেরা ফরয, ওয়াজিব ও মাসনূন নামাযের ক্ষেত্রে ততটা যত্নবান হয় না যতটা এ আমলগুলোর ক্ষেত্রে হয়।

(৪) এই আমলগুলোর সওয়াবের আশা ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতের সওয়াবের আশা অতিক্রম করে যায়।

(৫) সর্বোপরি কোন জাল হাদীসকে দীনের অংশ মনে করে পালন করা বিদ'আত এবং প্রচারকারী হাদীসের ভাষ্য মতে রাসূলের উপর মিথ্যারোপকারী। যার ঠিকানা জাহান্নাম বলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধমকি দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক! মোকছুদুল মো'মিনীন এর বহু **(৩৬ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)**

মৃত্যুকেন্দ্রিক রসম-রেওয়াজ

মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ

মৃত্যু অতি বাস্তব একটি বিষয়। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। কেউ মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ.

অর্থ : তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। যদিও তোমরা মযবুত অট্টালিকায় থাকো। (সূরা নিসা- ৭৮)

মানুষ বোঝে না, তাই মৃত্যু থেকে বাঁচতে চায় যা কখনো সম্ভব নয়। মানুষের উচিত জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করা যা সম্ভব। যে ব্যক্তি সময় থাকতে ঈমান ও আমল সংশোধন করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয় হাদীসের ভাষায় মৃত্যু তার জন্য উপহার। মৃত্যুতে তার কোন কষ্ট নেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تحفة المؤمن الموت.

অর্থ : মৃত্যু মুমিনের জন্য উপহার স্বরূপ। (শু'আবুল ঈমান; হা.নং ৯৪১৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

عن ابن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يموت بعرق الجبين.

অর্থ : মুমিন ব্যক্তি ললাটের ঘামের সাথে মৃত্যুবরণ করে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৪৫৬)

অর্থাৎ কপাল ঘর্মাক্ত হওয়া ব্যতীত তার মৃত্যুতে কোন কষ্ট অনুভব হয় না।

আর যে হেলায়-খেলায় জীবন কাটায়, মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয় না, হঠাৎ মৃত্যু তার সামনে উপস্থিত হয়। তখন তার কিছুই করার থাকে না। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয়া জরুরী। মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। আর মৃত্যুর পূর্বাপর কার্যাবলীও মৃত্যু প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত। সেই সফল মুমিন যে সারা জীবন আল্লাহর বিধান মোতাবেক জীবন কাটিয়ে আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়। বর্তমানে আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়া থেকে যেমন উদাসীন তদ্রূপ উদাসীন মৃত্যু পরবর্তী কাফন-দাফন ইত্যাদি শরীয়ত সম্মত পন্থায় বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে। ফলে আমাদের মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজন শরীয়ত নির্ধারিত কর্ম ও কর্ম পদ্ধতি বাদ দিয়ে এমন কিছু রসম-রেওয়াজে জড়িয়ে পড়ে যা গুনাহের কাজ। তাই আমরা এখানে মৃত্যু কেন্দ্রিক রসম-রেওয়াজ নিয়ে আলোচনা করবো যা পরিহার করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য আবশ্যক।

মৃত্যু পূর্ব রসম-রেওয়াজ

১. মৃত্যুর পূর্বে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানের অসিয়ত করা।

অনেকে মৃত্যুর পূর্বে চক্ষু, কিডনী ইত্যাদি অঙ্গ দানের অসিয়ত করে যায়। এটা শরীয়ত বিরোধী হারাম কাজ। কারণ, মানুষের কোন অঙ্গই তার মালিকানাধীন নয়। মালিকানা আল্লাহ তা'আলার। মানুষ কেবল সাময়িকভাবে তা ব্যবহার ও হেফাযত করার অধিকার রাখে। তাই দান করা হারাম। (ফাতাওয়া শামী ৫/৫৮)

২. মুমূর্ষু রোগীকে কালিমা পড়ার নির্দেশ দেয়া।

হাদীসে এসেছে, যার জীবনের সর্বশেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ উদ্দেশ্যে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালিমার তালকীন করা মুস্তাহাব। তালকীন বলা হয়, তার পাশে বসে এতটুকু আওয়াজে কালিমা পাঠ করা যেন তিনি নিজে শুনে পড়ে নেন। কিন্তু তাকে কালিমা পড়ার নির্দেশ দেয়া কিংবা বারবার পড়ানোর চেষ্টা করা অনুচিত। কারণ, মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি তা অস্বীকারও করতে পারেন। তাই একটি মুস্তাহাব বিষয়ের জন্য এমন পীড়াপীড়ি করা ঠিক নয়। (আদ্দুররুল মুখতার ২/১৯১)

৩. অনর্থক আই.সি.ইউ বা লাইফ সাপোর্টে রাখা।

এ কথা স্পষ্ট যে, হায়াত না থাকলে কোন কিছুই রোগীর কোন উপকারে আসবে না। তাই যে রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা নেই তাকে আই.সি.ইউ বা লাইফ সাপোর্টে রাখা অন্যায়। কারণ, তখন তার সাথে দেখা-সাক্ষাত করা যায় না, কালিমার তালকীন করা যায় না, তার পাশে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা যায় না, যা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের করণীয়। এর চেয়েও বেদনাদায়ক বিষয় হল, রোগীর মৃত্যু কখন হয় তা-ও নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। ফলে তার কাফন-দাফন সবকিছুই বিলম্বে হয়, যা নাজায়েয। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৩১৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২২২৯)

মৃত্যু পরবর্তী রসম-রেওয়াজ

৪. ধৈর্যের বিপরীত কোন বিষয় প্রকাশ করা।

আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদে কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। ধৈর্য ধারণ করা সওয়াবের কাজ। ধৈর্যের বিপরীত কোন কিছু প্রকাশ করা নাজায়েয। যেমন, উচ্চশব্দে ক্রন্দন করা, পরিধেয় বস্ত্র ছিড়ে-ফেড়ে ফেলা, মাথা-বুক চাপড়ানো, যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত নিষেধ তাদের সাথে একে অপরকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকা ইত্যাদি। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬২৯৪)

৫. মৃত ব্যক্তির নখ, চুল ইত্যাদি কর্তন করা।

মৃত ব্যক্তির পশম, মোচ, নখ, চুল ইত্যাদি কর্তন করা নাজায়েয। তার দাড়ি বা চুল আঁচড়ানো নিষেধ। বরং যা যেমন আছে তেমনই থাকবে। অনেকে না জানার কারণে মৃত ব্যক্তির নাভীর নিচের পশম কাটাকে সুন্নাত মনে করে। মৃত ব্যক্তির সতর দেখা কারো জন্য বৈধ নয়। আবার অনেক স্থানে মরদেহ মাটি বা ফ্লোরে রাখতে দেখা যায়। খাটিয়ায় রাখতে হবে; মাটিতে রাখা ঠিক নয়। (আদ্দুররুল মুখতার ২/১৯)

৬. বিভিন্ন অযুহাতে দাফনে বিলম্ব করা।

অনেক স্থানে বিভিন্ন ওযর দেখিয়ে দাফনে বিলম্ব করা হয় যা শরীয়ত সম্মত নয়। শরীয়তে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাইয়িতকে দাফন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সন্তানগণ দূরে থাকলে উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন দাফন সম্পন্ন করবে। সন্তানরা পরে এসে কবর যিয়ারত করবে। অনেক স্থানে মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখানোর জন্য অনেক সময় নষ্ট করা হয়। এটাও ঠিক নয়; বরং স্বাভাবিক কাজের মাঝেই দেখানোর কাজ সমাধা করা যায়। একান্ত প্রয়োজনে জানাযার পূর্বে অল্প সময়ের মধ্যে দেখানো যায়। তবে কোন অবস্থায়ই জানাযার পর কিংবা লাশ কবরে রাখার পর চেহারা দেখানো উচিত নয়। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২১৯)

৭. লাশ স্থানান্তর করা।

অনেকে মৃত্যুর পূর্বে লাশ গ্রামের বাড়িতে দাফন করার অসিয়ত করে যায়। আবার

অনেকের আত্মীয়-স্বজন স্বেচ্ছায় গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যায়, বিদেশ থেকে দেশে আনে। দাফন বিলম্ব হওয়ার কারণে এটা নাজায়েয। শরীয়তের বিধান হল, যে ব্যক্তি যে স্থানে মৃত্যুবরণ করবে তাকে পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের কোন কবরস্থানে দাফন করে দিবে। (আদ্দুররুল মুখতার ৬/৬৬৬)

৮. বহু স্থানে জানাযার পূর্বে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় 'লোকটি কেমন ছিল'। সবাই উত্তর দেয় 'ভালো ছিল'। মনে রাখা জরুরী যে, হাদীসে বর্ণিত ফযীলত বাধ্য করে সাক্ষ্য আদায় করার দ্বারা অর্জন হবে না।

অনেক স্থানে একাধিকবার জানাযা পড়া সওয়াববের কাজ মনে করা হয়; এটাও ঠিক নয়। জানাযার নামায একবার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে যদি মৃত ব্যক্তি কোন অভিভাবক জানাযা না পড়ে থাকে এবং তাদের কারো থেকে অনুমতি না নিয়ে জানাযা পড়া হয়ে থাকে তাহলে সে এবং যারা পূর্বে জানাযায় শরীক হয়নি তারা দ্বিতীয় বার পড়তে পারবে। বর্তমানে গায়েবানা জানাযার নামায পড়ার যে প্রথা রয়েছে তাও নাজায়েয। (ফাতহুল কাদীর ২/১৮, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ১/১৮)

৯. জানাযা নামাযের পর মাইয়িতের জন্য সম্মিলিতভাবে দু'আ করা।

অনেক স্থানে জানাযা নামাযের পর মাইয়িতের জন্য সম্মিলিতভাবে দু'আ করা হয়; এটা নাজায়েয। কারণ জানাযার নামাযই মাইয়িতের জন্য দাফনপূর্ব সর্বোত্তম দু'আ। আরেকটি বদরসম হল, কালিমা বা কুরআনের আয়াত খচিত চাদর দ্বারা খাটিয়া ও মৃত ব্যক্তিকে ঢেকে রাখা। কাফনের কাপড়ে বা মুর্দার কপালে কোন কিছু লিখে দেয়া। এ সবই নাজায়েয। (ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২/৪০১, আলবাহরুর রায়েক ২/৩২১)

১০. মুর্দার খাটিয়া কাঁধে নিয়ে কবরস্থানে যাওয়ার সময় উচ্চস্বরে কালিমা পড়তে থাকা।

অনেক জায়গায় মুর্দার খাটিয়া কাঁধে নিয়ে কবরস্থানে যাওয়ার সময় লোকেরা উচ্চস্বরে কালিমা পড়তে থাকে। এটা ঠিক নয়। বরং তখন মনে মনে মাইয়িতের জন্য ইসতিগফার করা উচিত। এ সময় অনেকে মাইয়িতের খাটিয়ার আগে আগে কিংবা পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। এটাও ঠিক নয়। বরং বহনকারীগণ ব্যতীত সবাই খাটিয়ার পেছনে চলবে এবং খাটিয়া যমীনে রাখার পূর্বে কেউ কবরস্থানে বসবে না। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৩১৮০, আহকামে মাইয়িত; পৃষ্ঠা ২৪০, ইমদাদুল মুফতীন; পৃষ্ঠা ১৬৪)

১১. কোন ওযর-আপত্তি ছাড়াই মসজিদে জানাযার নামায পড়া।

অনেক স্থানে অপারগতা ছাড়াই মসজিদে জানাযার নামায পড়া হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে যা মাকরূহে তাহরীমী। তাই ওযর ছাড়া কোন অবস্থায় মসজিদে জানাযার নামায পড়া যাবে না। (নসবুর রায়া ২/২৭, ফাতওয়া শামী ২/২২৪)

১২. কবর খনন সম্পর্কে অজ্ঞতা।

অধিকাংশ স্থানে সুন্নাত তরীকায় কবর খনন করা হয় না। চারকোণ-বিশিষ্ট গর্ত করে তাতে মুর্দাকে চিৎ করে শোয়ানো হয়; যা শরীয়ত সম্মত নয়। কবর খননের শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি দু'টি।

(ক) শেক বা বুগলী কবর। বুগলী কবর বলা হয়, প্রথমে চারকোণ-বিশিষ্ট কবর খনন করা। এরপর কবরের পশ্চিম দেয়ালের নিচে লাশের শরীর অনুপাতে পুনরায় এমনভাবে কাত করে পশ্চিম দিকে খনন করা যেন লাশ তাতে প্রবেশ করালে আপনাআপনি কেবলামুখী হয়ে যায়। মাটি শক্ত হলে এভাবে কবর খনন করা যায়। অন্যথায় সিন্দুক কবর খনন করতে হয়।

(খ) লাহাদ বা সিন্দুক কবর। সিন্দুক কবর বলা হয়, চারকোণ-বিশিষ্ট কবরের নিচে লাশের শরীর অনুপাতে আরেকটি কবর খনন করা। এ পদ্ধতিতেও লাশ কবরে রাখা মাত্রই তা কেবলামুখী হয়ে যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এর কোনটিই করা হয় না। আর কবর পাকা করা ও টাইলস করার যে প্রথা চালু হয়েছে তাও শরীয়ত পরিপন্থী। তবে কবর হেফাযতের জন্য কবরস্থানের চারপাশের দেয়াল পাকা করা যায়। কবরস্থানে সামিয়ানা টানানো, লাইটিং করা, আগরবাতী বা মোমবাতী ইত্যাদি জ্বালানো সবই গুনাহের কাজ। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১০৫২)

দাফন পরবর্তী রসম-রেওয়াজ

১৩. সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে অনেক এলাকায় তিনদিনা, সাতদিনা, ত্রিশা, চল্লিশা এ জাতীয় রসমি অনুষ্ঠান করা হয়। আবার অনেক স্থানে প্রচলিত মীলাদ-কিয়াম করা হয়। এ সবই কুসংস্কার ও বিদ'আত। (ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৫/৪৪৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ১/৩৯৬)

১৪. জন্মবার্ষিকী পালন করা, মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা ইহুদী-খ্রিস্টান ও হিন্দুদের প্রথা। সঠিক জ্ঞানের অভাবে অনেক মুসলমানও এগুলোকে সওয়াবের কাজ মনে করে। কিন্তু বাস্তবে এ সবই গুনাহের কাজ। তবে মৃত ব্যক্তিগণ সর্বদাই সওয়াব রেসানীর প্রত্যাশা রাখে। তাই দিন-তারিখ নির্দিষ্ট না করে তাদের জন্য বেশি বেশি সওয়াব রেসানী করা জরুরী। (সূরা বনী ইসরাঈল- ২৪, সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৪৬০৩)

১৫. সওয়াব রেসানীর আরেকটি পন্থা হল, গরীব-মিসকীনকে খানা খাওয়ানো। এটা ভালো কাজ। তবে অনেকেই মৃত ব্যক্তির সম্পদ ভাগ করার পূর্বে ইজমালী সম্পদ থেকে খানার ব্যবস্থা করে যা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল, যদি ওয়ারিশগণ সবাই বালেগ হয় এবং সম্মত হয় তবে বৈধ হবে। কিন্তু যদি কেউ নাবালেগ থাকে কিংবা বালেগ হওয়া সত্ত্বেও সম্মত না হয় তবে বৈধ হবে না। কারণ, এতিমের অনুমতি যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি ছাড়া কারো মালে হস্তক্ষেপ করাও বৈধ নয়। (সূরা নিসা- ২৯, শু'আবুল ঈমান; হা.নং ৯৪৯২)

১৬. টাকা-পয়সার বিনিময়ে সওয়াব রেসানী করাও সহীহ নয়। মৃত ব্যক্তির জন্য অর্থ দিয়ে কুরআন খতম করা হলে কোন সওয়াব পাওয়া যায় না। মাইয়িতের কাছে কোন সওয়াব পৌঁছে না। তাই অর্থ দিয়ে সওয়াব রেসানী না করে আত্মীয়গণ নিজেরাই তাওফীক অনুযায়ী তিলাওয়াত করে দু'আ করে দেয়া উত্তম। (ফাতাওয়া শামী ২/২৪১, আহসানুল ফাতাওয়া ১/২৭৫)

১৭. মাইয়িতের সম্পদ বণ্টনে বিলম্ব করা। মৃত্যুর পর মাইয়িতের রেখে যাওয়া সকল সম্পদ ফারায়েয অনুপাতে সকল ওয়ারিশের অংশ হয়ে যায়। এ সম্পদ বণ্টনে বিলম্ব করার অর্থ দু-চার জন ওয়ারিশ কিংবা শুধু ভাইয়েরা সকলের সম্পদ ভোগ করা; যা কখনোই বৈধ নয়। এজন্য সামাজিকভাবে যে মাইয়িতের স্থলাভিষিক্ত হবে তাদের দায়িত্ব সম্পদের ফারায়েয করে তা বণ্টন করে যার যার অংশ যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়া। কেউ অনুপস্থিত থাকলে বা নাবালেগ কিংবা নিজ সম্পদ রক্ষায় অপারগ হলে তার অংশের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে দেয়া।

১৮. স্ত্রী জীবিত রেখে স্বামী মারা গেলে চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর উপর ফরয। এ সময়ে সে অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে না, সাজসজ্জা বর্জন করবে। একমাত্র চিকিৎসা কিংবা নিরাপত্তার প্রয়োজন ছাড়া নিজ ঘরোয়া পরিবেশ ছেড়ে বাইরে যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল কুসংস্কার থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ মুহাম্মাদিয়া কড়াইল, টি অ্যান্ড টি কলোনী, বনানী, ঢাকা।

নারীর দীনী শিক্ষা

মুফতী সাইফুর রহমান

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. ও হযরত হাওয়া আ. হতে পৃথিবীর সকল নারী-পুরুষকে একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا...إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

অর্থ : হে লোক সকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার অছিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাক। এবং আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করা) কে ভয় কর। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন। (সূরা নিসা-১)

সৃষ্টির একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় উদ্দেশ্যটি এ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন,

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا.

অর্থ : আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। তারপর তাকে এমন বানিয়েছি যে, সে শোনেও দেখেও। (সূরা দাহর-২)

কী বিষয়ে তিনি পরীক্ষা করতে চান, তা ব্যক্ত করেছেন এভাবে,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ.

অর্থ : যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কর্মে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। তিনিই পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক, অতি ক্ষমাশীল। (সূরা মুল্‌ক-২)

অন্যত্র বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.

অর্থ : আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে। আমি তাদের কাছে কোন রিযিক চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাবার দিক। আল্লাহ নিজেই তো রিযিকদাতা এবং তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। (সূরা যারিয়াত- ৫৬-৫৮)

বোঝা গেল, সৎকর্মে কে উত্তম? আল্লাহ তা'আলা এটাই দেখতে চান।

আল্লাহর উদ্দেশ্য পূরণকারীর জন্য অসাধারণ পুরস্কারের ঘোষণা

আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য পূরণ করলে মানব জাতির কী লাভ হবে, সে সম্পর্কে তিনি বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থ : যে ব্যক্তিই মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করব। (সূরা নাহ্‌ল- ৯৭)

সৎকর্মের প্রতিযোগিতায় নারী-পুরুষ যে-ই অগ্রগামী হবে, তার জন্যেই রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অফুরন্ত শান্তি ও সাফল্যের নিশ্চয়তা- দুনিয়াতেও, আখেরাতেও। শান্তি ও সাফল্যের এ নিশ্চয়তা শুধু পুরুষদের জন্য নয়, বরং নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

মোটকথা, তাঁর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অধিকার সকলের রয়েছে সমানভাবে। অন্যত্র বলেছেন,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ ...وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

অর্থ : নিশ্চয়ই আনুগত্য প্রকাশকারী পুরুষ ও আনুগত্য প্রকাশকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, ইবাদতগোজার পুরুষ ও ইবাদতগোজার নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, আন্তরিকভাবে বিনীত পুরুষ ও আন্তরিকভাবে বিনীত নারী, সদকাকারী পুরুষ ও সদকাকারী নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও হেফাজতকারী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী– আল্লাহ্ এদের সকলের জন্য মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা আহযাব- ৩৫)

সফলতার জন্য চাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা

যেনতেনভাবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে পুরস্কারও যেনতেন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে অগ্রগামী হতে হলে চাই প্রতিযোগিতা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তর জ্ঞান ও অধিকতর দক্ষতা। জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে যে প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে, তাকে কি কোন মূর্খ ও 'তিফলে-মকতব' ছাড়িয়ে যেতে পারে? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا...إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

অর্থ : তবে কি (মুশরিক ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে,) যে রাতের মুহূর্তগুলোর ইবাদত করে, কখনও সিজদাবস্থায়, কখনও দাঁড়িয়ে, যে আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা করে? বল, যে ব্যক্তি জানে আর যে জানে না উভয়ে কি সমান? (কিন্তু) উপদেশ গ্রহণ তো কেবল বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই করে। (সূরা যুমার- ৯)

বোঝা গেল, সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করা, দিলের মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং তাঁর রহমতের আশা তৈরী হওয়া তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা জেনে-শোনে কাজগুলো সম্পাদন করে। আর যে জানবে না, সে তো স্খলিত হতে হতে মুশরিক হয়ে যেতে পারে। অজ্ঞ থাকলে তো প্রতিযোগী অন্ধ থেকে গেল!

না জেনে না শোনে অন্ধের মত প্রতিযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লে পূর্ণ মুমিন হওয়া যায়?

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا.

অর্থ : এবং যখন তাদের প্রতিপালকের আয়াত দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা বধির ও অন্ধরূপে তার উপর পতিত হয় না। (সূরা ফুরক্বান-৭৩)

আল্লাহ তা'আলা যত বিধান নাযিল করেছেন- চাই পুরুষদের জন্য হোক বা নারীদের জন্য হোক, যদি সে বিধান হতে চোখ-কান বন্ধ করে রাখে, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে কিয়ামতের দিন ভুলে যাবেন।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي...قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى.

অর্থ : আর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সঙ্কটময়। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব। সে বলবে, হে রব্ব! তুমি আমাকে অন্ধ করে উঠালে কেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম! আল্লাহ বলবেন, এভাবেই তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজ সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে। (সূরা ত্বা-হা- ১২৪-১২৬)

আল্লাহ তা'আলা নিজে মানব জাতিকে কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত তিলাওয়াতযোগ্য প্রথম ওহীতে তিনি বলেন,

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

অর্থ : পড় এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।" (সূরা আলাক- ২-৫)

প্রয়োজনীয় বিষয় জানা বা ইলম হাসিল করা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর জন্যই মৌলিক অধিকার। এ ব্যাপারে নারীদেরকে পৃথক ভাবার কোন সুযোগ নেই।

আল্লাহ তা'আলা পরিবারের সকলকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর নির্দেশ দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا .....وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

অর্থ : হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর কোন হুকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়। (সূরা তাহ্রীম- ৬)

হাদীস শরীফে আছে,

إنما النساء شقائق الرجال

অর্থ : নিশ্চয় নারীরা হল পুরুষদের অর্ধাঙ্গিনী। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২০৪, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১০৫)

প্রতিটি নারীইতো পরিবারের অংশ। কাজেই তাদেরকে দীনী শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা পুরুষদের যিম্মায় ওয়াজিব করা হয়েছে।

নারীদেরকে দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করার ফযীলত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যাদের তা'লীম তরবিয়াতের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন,

من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة.

অর্থ : যে ব্যক্তি তিন কন্যার ভরণ-পোষণ করবে, তাদেরকে শরয়ী আদাব ও বিধি-বিধান শিক্ষা দিবে, তাদেরকে বিবাহ-শাদী দিয়ে দিবে ও তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৫১৪৭)

নারীদের ইসলামী শিক্ষায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবদান

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষ সাহাবীদের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে নারী সাহাবীদের জন্যও বিশেষভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যেন তারা ইল্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে না পড়ে,

عن أبي سعيد الخدري، قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن ...

অর্থ : মহিলা সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পুরুষরা তো (সরাসরি আপনার মুখের বাণী অধিক পরিমাণে শ্রবণ করে) আমাদের থেকে অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে। (আমরাও তো অগ্রগামী হতে চাই,) সুতরাং আমাদেরকে নসীহত করার জন্য আপনার পক্ষ হতে কোন একটি দিবস নির্দিষ্ট করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য বিশেষ একদিনের প্রতিশ্রুতি দান করলেন, যে দিনটিতে তিনি তাদেরকে নসীহত করেছেন এবং (বিভিন্ন বিষয়ে) নির্দেশ প্রদান করেছেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১০২)

এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ্ রাযি.কে বললেন,

ألا تعلمين هذه رقية النملة، كما علمتيها الكتابة؟

অর্থ : হে শিফা! তুমি কি হাফসা রাযি.কে পিঁপড়ার ঝাড়ফুঁক শিক্ষা দিবে না, যেমনিভাবে তুমি তাকে হাতের লেখা শিখিয়েছ? (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৩৩৯১)

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন 'উম্মী' হওয়া সত্ত্বেও হযরত উম্মুল মুমিনীন হাফসা রাযি.কে হাতের লেখা শিখানো এবং ঘরোয়া চিকিৎসা শিখানোর প্রতি যত্নবান ছিলেন।

সকলের ইলমে দীন বৃদ্ধি হয়ে যাক!

আল্লাহ্ তা'আলা চান, আমরা যেন তাঁর কাছে ইলমে দীন বৃদ্ধির দু'আ করি,

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.

অর্থ : এবং (এই বলে) দু'আ করতে থাক যে, হে আমার প্রতিপালক! জ্ঞানে আমাকে আরও উন্নতি দান কর। (সূরা ত্বা-হা- ১১৪)

তাই, আমরাও আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি, হে আল্লাহ্! তুমি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ইলম বৃদ্ধি করে দাও। আ-মীন!

উভয়ে উভয়ের ব্যাপারে যিম্মাদার, তবে পুরুষের রয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

অর্থ : আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে। অবশ্য তাদের উপর পুরুষদের এক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাক্বারা- ২২৮)

যদি পর্যাপ্ত ইলমে দীন তাদের না থাকে, তাহলে তারা কীভাবে জানবে যে, তাদের যিম্মায় কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে? আর কিভাবেই বা তারা জানবে যে তাদের উপর পুরুষদের কী কী অধিকার রয়েছে?

মুমিন নারী-পুরুষগণ পরস্পর সহযোগী

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ... أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

অর্থ : মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে একে অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ নিজ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক। (সূরা তাওবা- ৭১)

মুমিন নারী-পুরুষের সহযোগিতা চার দিক থেকে হতে পারে-

১. পুরুষ সহযোগিতা করবে পুরুষের ২. নারী সহযোগিতা করবে নারীর ৩. পুরুষ সহযোগিতা করবে নারীর ৪. নারী সহযোগিতা করবে পুরুষের।

অর্থাৎ প্রত্যেকেই যার যার অবস্থানে থেকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত কাজে ও পন্থায় কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন

না করে ইখলাসের সাথে সহযোগিতা করবে।

আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে সহযোগিতার ৫টি ক্ষেত্র উল্লেখ করেছেন-

১. সৎকাজের আদেশ করা ২. অসৎ কাজে বাধা দেয়া ৩. নামায কায়েম করা ৪. যাকাত আদায় করা ৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা।

এসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সকলের সহযোগী। এটাই মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। কাজগুলো সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার জন্য পুরুষদের জন্য যেমনিভাবে পর্যাপ্ত ইলম প্রয়োজন, নারীদের জন্যও অবশ্যই পর্যাপ্ত ইলম অর্জনের ব্যবস্থা করা এবং এ ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতা করা এ আয়াতের দাবী। যদি তারা এভাবে সহযোগিতার ধারা বজায় রাখে, তাহলেই سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ তাদের উপর আল্লাহর নিশ্চিত রহমত আসবে। তাদের জন্যই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা,

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

অর্থ : আল্লাহ মুমিন নর ও মুমিন নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন উদ্যানরাজির, যার তলদেশে নহর বহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসস্থানের, যা চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস (যা জান্নাতবাসীগণ লাভ করবে)। এটাই মহা সাফল্য। (সূরা তাওবা- ৭২)

কিন্তু সেই মুমিন নারী-পুরুষ যদি অন্য মুমিন নারী-পুরুষের জন্য হেদায়াতের দিশারী, কল্যাণকামী, ইবাদতগুজার, পরোপকারী, সহানুভূতিশীল এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত অনুগত না হয়ে অন্যদের সঙ্গে নিছক পার্থিব সুবিধা লাভের জন্য সম্পর্ক রেখেই সন্তুষ্ট থাকে এবং তাদেরকে দীন সম্পর্কে অবগত না করে, দীনী পরিবেশে প্রতিপালিত না করে, দীন চর্চার প্রতি উদ্বুদ্ধ না করে সীমাহীন অজ্ঞতার দিকে ঠেলে দেয়, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা বা জ্ঞান-স্বল্পতাকে উৎসাহিত করে, তাহলে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف (তারা মন্দ কাজের আদেশ করে ও ভাল কাজে বাধা দেয়) সেই মুমিনদের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে। তারা যদি ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাদের সাধ্য, সামর্থ্য ও অর্থ ব্যয় না করে, তাহলে তারা হবে وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ (তারা নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে) এর দৃষ্টান্ত।

তারা যদি তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ-তরীকা ভুলে যায়, তাহলে তারা হয়ে যাবে সেই মুনাফিকদের মতো, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ (তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন।) এমন যদি হয় মুমিনদের অবস্থা, তাহলে জাহান্নামের আগুন তারা কীভাবে এড়াতে পারবে? তারাতো আল্লাহর রহমত হতে অনেক দূরে তার অভিসম্পাতে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ.

অর্থ : আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী এবং সমস্ত কাফেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন, আর তাদের জন্য আছে স্থায়ী শাস্তি। (সূরা তাওবা-৬৮)

নারীর জন্য যেসব গুণাবলী আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন,

عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا.

অর্থ : সে যদি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে শীঘ্রই তাকে দিতে পারেন এমন স্ত্রী, যারা হবে তোমাদের চেয়ে উত্তম, মুসলিম, মুমিন, অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদতগোজার, রোযাদার, তারা বিধবা হবে বা কুমারী। (সূরা তাহরীম- ৫)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোৎকৃষ্ট জীবনসঙ্গিনী প্রদান করার সুসংবাদ দিয়েছেন, যাঁরা এসকল গুণাবলীর অধিকারী হবেন-

১) মুসলিম নারী অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মান্যকারিনী, একান্ত অনুগতা।
২) মুমিন নারী অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ হতে নির্দেশিত ও নিষিদ্ধ সকল বিষয়ের সত্যায়ণকারিনী, আস্থাশীলা।
৩) একান্ত অনুগত নারী অর্থাৎ মজ্জাগতভাবে অনুগত। সর্বদা ইবাদতে নিমগ্ন।
৪) তওবাকারিনী অর্থাৎ স্বীয় গুনাহ ও নাফসের আনুগত্য ত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের দিকে প্রত্যাবর্তন কারিনী।
৫) ইবাদতগোজার অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে ইবাদত কারিনী।
৬) রোযাদার নারী অর্থাৎ দুনিয়াবী পাথেয়ের প্রতি অনাগ্রহী নারী।

এরা বিধবা হোক বা কুমারী হোক অর্থাৎ পূর্বোক্ত গুণাবলী যে কোন নারী অর্জন করতে পারে- চাই সে কুমারী হোক বা বিধবা হোক। (তাফসীরে কুরতুবী)

আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলিম রমনীকে এ সকল গুনাবলী অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : মুহাদ্দিস, আল মাদরাসা আল মাদানিয়া আল আরাবিয়া (মিরপুর মহিলা মাদরাসা)

(৩১ পৃষ্ঠার পর, মোকছুদুল মো'মিনীন)

বিষয়ের ক্ষেত্রে বর্ণিত নীতিগুলো প্রযোজ্য নয়। এছাড়া আরো বহু আপত্তি আছে যা এই কিতাবের উপর আরোপিত হয়। যা সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই সূত্রবিহীন এ জাতীয় বই পড়ে আমল করা মোটেও নিরাপদ নয়। এর বিপরীতে বর্তমানে আরেক শ্রেণীর লোক নিজেরাই সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে মাসাইল সংগ্রহ করে আমল শুরু করে দিয়েছে; অথচ সেটা আরেক ধরনের গোমরাহী। যদি মুমিনের লক্ষ্য (মাকসাদ) ইবাদতের মাধ্যমে জান্নাতের চাবি (কুঞ্জি) লাভ করা হয়, তাহলে আল্লাহর হুকুম ও তার রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী চলার বিকল্প নেই। যা জানতে হবে হক্কানী উলামায়ে কেরামের সংশ্রবে থেকে এবং তাদের দিক নির্দেশনায় বিভিন্ন দীনি বই পড়ে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহীহ জ্ঞান অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : খতীব, বাইতুল আমান জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা।

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

পবিত্রতা

মুহাম্মাদ শাহনেওয়াজ
ধানমন্ডি, ঢাকা

১০৮ প্রশ্ন : আমি দীর্ঘদিন যাবত দুটি সমস্যায় মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। সমস্যা দুটি হল-

(১) সুন্নাত তরীকায় ইস্তিঞ্জা করার পর যখন যে ওয়াক্তেই নামাযে দাঁড়াই তখনই আমার মনে হয় দু-এক ফোঁটা পেশাব বের হয়ে গেছে। অনেক সময় পরীক্ষা করে এমনটিই পাই। যে কারণে কাপড় পরিবর্তন করে পুনরায় নামায পড়ি। অনেক সময় সফর এবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে নামাযের ১৫/২০ মি. পূর্বে ইস্তিঞ্জা করা সম্ভব হয় না এবং সাথে কোন কাপড়ও থাকে না যা পরিধান করে নামায দোহরাবো। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী? আমি কি মা'যূর বলে গণ্য হব?

(২) যখনই আমি নামাযে দাঁড়াই তখনই আমার মনে হয় যে, বায়ু বের হয়ে গেল। অধিকাংশ সময় স্পষ্টতই বুঝতে পারি যে, বায়ু বের হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে আমার করণীয় কী?

উল্লেখ্য যে, এ উভয় অবস্থা নামাযের পূর্বে এবং পরে তেমনটি পরিলক্ষিত হয় না। নামাযে দাঁড়ালেই এসব সমস্যার সম্মুখীন হই। এ থেকে বাঁচার পদ্ধতি কি?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, নামাযের সময় আপনি ওয়াসওয়াসার রোগে ভোগেন। এক্ষেত্রে আপনার করণীয় হল, আপনি উযূ করে নামায পড়ে নিবেন। পেশাব কিংবা বায়ু বের হল কিনা সেটার প্রতি খেয়াল করবেন না এবং কখনোই পরীক্ষা করতে যাবেন না। আপনি পরীক্ষা করতে যান বলেই এ রোগ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরীক্ষা করা ছাড়াই যদি কখনো কাপড় ভিজা দেখেন তাহলে কাপড় পরিবর্তন করে পুনরায় উযূ করে নামায আদায় করবেন। বায়ুর ক্ষেত্রে যে যাবত বায়ু বের হওয়ার শব্দ না শুনবেন বা নাকে গন্ধ অনুভব না করবেন অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস না হবে ততক্ষণ বায়ুর কারণে আপনার উযূ ভাঙবে না। (কাওয়াইদুল ফিকহ; পৃষ্ঠা ১৪৩, আলআশবাহ ওয়াননাযাইর; পৃষ্ঠা ৭৭, মুআত্তা ইমাম মালেক ১/১০০, শরহুত তীবী আলা মিশকাতিল মাসাবীহ ১/২৩১)

ইবাদত

আতীকুর রহমান
হাজীগঞ্জ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

১০৯ প্রশ্ন : নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর শরয়ী সমাধান জানতে চাই-

(ক) বিভিন্ন মাযারে মানত হিসেবে যেসব বস্তু দেয়া হয় সেগুলোর হুকুম কি? যারা এর দায়িত্বে থাকেন তাদের জন্য সেগুলো ভোগ করা বা এর উপযুক্ত মূল্য সদকা করে ভোগ করা জায়েয হবে কিনা?

(খ) যদি জায়েয না হয় তাহলে সেসব বস্তু বা তার মূল্য মসজিদ-মাদরাসা বা অন্য কোন জনসেবামূলক কাজে ব্যয় করা যাবে কিনা?

(গ) ইতিপূর্বে অসতর্কতা বশত যেসব বস্তু গ্রহণ করা হয়েছিল যার কিছু এখনো বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে করণীয় কি?

(ঘ) মাযার সংলগ্ন বা অন্য যেকোন মসজিদে মানত হিসেবে যেসব পশু বা বস্তু আসে সেগুলোর হুকুম কি? সেগুলো মসজিদের কাজে ব্যয় করা যাবে কিনা?

(ঙ) মাযারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ভক্তদের বিভিন্ন শিরকী কাজ থেকে বিরত রাখা এবং দায়িত্ব পালনের অন্তর্বর্তীকালীন তাদের ভাগে আসা মানতের বস্তুসমূহ সদকা করার মানসে দায়িত্ব পালন করা জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : (ক) মাযারের নামে মানত করা হারাম এবং মানতের বস্তুসমূহও হারাম। কারণ মানত একটি ইবাদত। আর ইবাদত আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা জায়েয নেই। গাইরুল্লাহর নামে কোন কিছু উৎসর্গ করা যেমন হারাম তেমন উৎসর্গকৃত বস্তুসমূহও হারাম। মাযারের দায়িত্বশীলদের বা অন্য কারো জন্য এগুলো ভোগ করা জায়েয হবে না। বরং প্রকৃত মালিক বা তার অবর্তমানে তার উত্তরাধিকারীদের খুঁজে বের করে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

তবে যদি মাযারের প্রতিবেশীরা সদকা গ্রহণ করার মত গরীব হয় তাহলে তাদেরও সেটা গ্রহণের সুযোগ থাকবে। কেউ তাদেরকে হাদিয়া হিসেবে কিছু দিতে চাইলে তা নিতে পারবে।

উল্লেখ্য, মাযার সংস্কৃতি পুরোটাই শরীয়ত বিরোধী। মাযার নির্মাণ করা, সেখানে বাতি ও সুগন্ধির ব্যবস্থা করা, দানবাক্স বসানো, নিয়মিত ঝাড়ু দেয়া ইত্যাদি সবই মাযার পূজাকে উৎসাহিত করে। কাজেই এসব কাজের ব্যবস্থাপনা যারা করে তারা মাযারের খাদেম নয়; বরং গুনাহ ও শিরকের খাদেম। এদের গোটা কর্মকাণ্ডই নাজায়েয ও হারাম। মুসলমান জনসাধারণের জন্য নিজ নিজ এলাকায় এ জাতীয় মাযার গড়ার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা জরুরী। আর পূর্ব থেকে প্রচলিত এমন মাযার সংস্কৃতিকে বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া অপরিহার্য। (সূরা আহকাফ- ৩, সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৪৪০, আদদুররুল মুখতার ২/৪৪০, আলবাহরুর রায়েক ২/৫২১, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৪০৩, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/১৫৭, আলমউসূআতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ৩৪/৩৪৫, উমদাতুর রি'আয়াহ ২/৫২৯, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম ওয়ালআকীদাহ ২৪/২৫, মুলতাকাল আবহুর ১/৩৭৬, ইমদাদুল আহকাম ১/১৮৬, ১/২০১, ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/২১৫)

(খ) ও (গ) এসব বস্তু বা তার মূল্য মসজিদ-মাদরাসা বা অন্য কোন জনসেবামূলক কাজে ব্যয় করা যাবে না। বরং কোন গরীবকে সদকা করে দিতে হবে। আর ইতিপূর্বে যেসব বস্তু গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো থেকে যা অবশিষ্ট আছে তা দান করে দিতে হবে। আর যেগুলো ব্যবহার করা হয়ে গেছে তার আনুমানিক মূল্য হিসাব করে কোন গরীবকে দিয়ে দিতে হবে। (আদদুররুল মুখতার ১/৬৫৮, আলমউসূআতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ৩৪/৩৪৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া)

(ঘ) মূলত মসজিদের নামে মানত মানা নাজায়েয। তবে মানত হিসেবে মসজিদে যেসব বস্তু এসে থাকে তা যদি আল্লাহ তা'আলার নামে মানা মানতের বস্তু হয়ে থাকে তাহলে তা মানত হবে না। বরং নফল দান হিসেবে গণ্য হবে এবং তা মসজিদের যে কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে।

আল্লাহ তা'আলার নামে মানত মানার অর্থ হল, শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য মানত করা যাতে অন্য কারো খুশি বা অখুশির নিয়্যত করা হয় না। যেমন

কেউ মানত মানল, যদি আমার অমুক নেক বাসনা আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ করেন তাহলে আমি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য অমুক এলাকার গরীব লোকদের খাওয়াব বা অমুক মসজিদে অমুক বস্তু দান করব। তাহলে এমন মানতের বস্তুর ব্যবহার জায়েয হবে। (আদদুররুল মুখতার ২/৪৩৯, আলবাহরুর রায়েক ২/৫২১, বাযলুল মাজহুদ ৪/২২৫)

(ঙ) যদি তার প্রবল ধারনা হয় যে, তিনি দায়িত্ব পালন করলে লোকদেরকে এ শিরকী কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবেন, তাহলে তার জন্য দায়িত্ব নেয়া জায়েয আছে। বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা আবশ্যকও হয়ে যেতে পারে। যেমন ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপারে যদি জানা থাকে যে, আমি অবশ্যই তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারব তাহলে সে ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করা তার জন্য আবশ্যক। (সূরা লুকমান- ১৭, সহীহ মুসলিম ১/৬৯, ফাতহুল বারী ১৩/৫৩, শরহুন নাবাবী ২/২২, উমদাতুল কারী ৪/৪৮৫, বাযলুল মাজহুদ ২/২০৩, আদদুররুল মুখতার ১/৩৫০)

মুহাম্মাদ বিন মাহবুবুর রহমান
শিক্ষার্থী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

১১০ প্রশ্ন : (ক) আমার শ্বশুর একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তিনি আমাকে ঈদ উপলক্ষে এক সেট পোশাক দিয়েছেন যা আমাকে পরিধান করতে হবে। আমার জানার বিষয় হল, উক্ত পোশাকটি কোন উপায়ে হালাল করা যাবে কিনা? যেমন মূল্য পরিশোধ করে দেয়া বা উক্ত পোশাকের পরিবর্তে অন্য কোন হাদিয়া হাদিয়াদাতাকে দেয়া যাবে কিনা?

(খ) রমাযান মাসে রোযা অবস্থায় মুখে মেকআপ করা যেমন ঠোঁটে লিপস্টিক অথবা চোখে কাজল বা আইলাইনার দেয়ায় রোযার কি কোন ক্ষতি হবে?

উত্তর : (ক) সুদভিত্তিক ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানে যারা চাকুরী করেন, গুনাহের কাজে সহযোগিতা করার দরুণ তারাও গুনাহগার হবেন এবং এর বিনিময়ে অর্জিত অর্থও হালাল হবে না; বরং হারাম হবে। যে অর্থ দ্বারা কাউকে দাওয়াত করলে বা হাদিয়া দিলে অপরের জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। অবশ্য তার অধিকাংশ উপার্জন হালাল হলে বা হালাল অর্থ হতে দাওয়াত বা হাদিয়া দিলে গ্রহণ করার অবকাশ আছে।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে যদি আপনার শ্বশুরের অধিকাংশ উপার্জন হালাল হয় বা হালাল অর্থ দিয়ে আপনাকে উক্ত পোশাক সেট দিয়ে থাকে, তাহলে তা পরিধান করা আপনার জন্য জায়েয হবে। অন্যথায় উক্ত পোশাক ব্যবহার করা আপনার জন্য জায়েয হবে না। পারিবারিক কারণে পরিধান করতে হলে এক দু'বার পরিধান করে কোন গরীবকে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে দিবেন। আর কিছু টাকাও সদকা করে দিবেন। সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে তওবা করে নিবেন। (সূরা মায়িদা- ২, সূরা মুমিনূন- ৫১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৫৯৯, ফাতাওয়া শামী ৫/৯৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/২২, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩/১৭৩)

(খ) রমাযান মাসে রোযা অবস্থায় ঠোঁটে লিপস্টিক ব্যবহার করা মাকরূহ। তবে চোখে কাজল বা আইলাইনার দিলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। (সুনানে ইবনে মাজাহ ১/৫৩৬, আলমউসূআতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ২৮/৮১, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৩৪)

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
শ্রীবর্দী

১১১ প্রশ্ন : কোন মহিলা যদি স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে বেড়াতে যায় এবং দুই বাড়ির মাঝে সফরের দূরত্ব থাকে সাথে সাথে পনের দিনের কম থাকার নিয়ত করে তাহলে কি সে নামায পুরা পড়বে না কসর করবে? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : কোন মহিলা যদি বাপের বাড়িতে মাঝে মধ্যে আসা-যাওয়া জারী রাখে এবং বাপের বাড়িতে নিজের মতোই যে কয়দিন ইচ্ছা থাকা-খাওয়া চলে, তাহলে বাপের বাড়িতে সে মুকীম গন্য হবে। ফলে সে পূর্ণ নামায আদায় করবে।

আর যদি পিত্রালয়ে স্বাভাবিক যাতায়াত না থাকে এতটাই কম আসা-যাওয়া হয় যে, কখনো গেলে সেখানে সে মেহমান হিসেবে বিবেচিত হয় এবং মেহমানের মত দু-চার বেলা খেয়ে-দেয়ে নিজেই চলে যেতে বাধ্য হয়। সেক্ষেত্রে পিত্রালয়ে সে মুসাফির গণ্য হবে। ফলে সে কসর করবে। (রদ্দুল মুহতার ২/১৩১, হালবী কাবীর; পৃষ্ঠা ৪৬৮, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৪/৪৫৮)

ডা. রেজাউল করীম মুসলিমী
ক্যান্টনমেন্ট, মিরপুর-১৪, ঢাকা

১১২ প্রশ্ন : গত বছর আমি এবং আমার মা একত্রে হজ্জে তামাত্তু করার সৌভাগ্য লাভ করি। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা তাতে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার বিষয় জানতে পারি। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল। আশা করি তার সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

(ক) হজ্জে তামাত্তু কারীর জন্য তামাত্তুর উমরা করার পর হজ্জ শুরু করার পূর্বে নফল উমরা করতে পারবে কি? যদি কেউ করে তবে তার হুকুম কি?

(খ) আমার মা অনেক বয়স্ক ও দুর্বল হওয়ায় তিনি নিজ হাতে কঙ্কর মারতে অক্ষম ছিলেন। ফলে আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জের সমস্ত কঙ্কর যথাসময়ে মেরে দিয়েছি। তা সহীহ হয়েছে কিনা? না হলে এখন আমার করণীয় কি?

(গ) গত বছর আমার ভাইয়ের গুরুতর অসুস্থতার কারণে একদিনের কঙ্কর মারা হয়নি। এতে তার উপর কি দম ওয়াজিব হবে? হলে এখন তা আদায় করার পদ্ধতি কি?

উত্তর : (ক) হজ্জে তামাত্তুকারী তামাত্তুর উমরা করে হালাল হওয়ার পর হজ্জের পূর্বে মক্কায় থাকাকালীন নফল উমরা করতে পারবেন, তাতে কোন অসুবিধা হবে না। আর এ উমরা তামাত্তুর উমরাকে বাতিল করবে না এবং হজ্জে তামাত্তুরও সমস্যা হবে না। তবে এ অবস্থায় অধিক পরিমাণে নফল উমরা করা থেকে অধিক পরিমাণে নফল তাওয়াফ করা উত্তম; বিশেষ করে হজ্জের কাছাকাছি সময়ে। (সূরা বাকারা, সূরা হজ্জ, রসাইলে মোল্লা আলী ক্বারী; পৃষ্ঠা ২৭১, ২৮৩, গুনয়াতুন নাসিক [জাদীদ]; পৃষ্ঠা ২১৮, উমদাতুল কারী ৭/৪০১, কিতাবুল মাসাইল ৩/২৭৩)

(খ) কঙ্কর নিজ হাতে মারা ওয়াজিব। আপনার মা যদি এতটাই দুর্বল থেকে থাকেন যে, যেকোন উপায়ে কঙ্কর মারার স্থানে পৌছে নিজ হাতে কঙ্কর মারতেও অক্ষম তাহলে তার অনুমতি নিয়ে আপনার মেরে দেয়া সহীহ হয়ে গেছে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৩০০, বাদায়িউস সানায়ে ২/৩২৩, গুনইয়াতুন নাসেক; পৃষ্ঠা ১৮৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫৩৪, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/২৬৩)

(গ) কঙ্কর মারা হজ্জের ওয়াজিব সমূহের একটি। আর শরয়ী ওযর ব্যতীত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একদিনের সমস্ত কঙ্কর বা অধিকাংশ কঙ্কর মারা না হলে বকরী দিয়ে দম দেয়া ওয়াজিব। আর যেহেতু গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় নিজে না পারলে অন্য কারো মাধ্যমে কঙ্কর মারার সুযোগ শরীয়তে ছিল। তা সত্ত্বেও আপনার ভাইয়ের যখন একদিনের সমস্ত কঙ্কর মারা হয়নি। তাই তার দম দিতে হবে। সম্ভব হলে নিজে পুনরায় হারামে গিয়ে বা সম্ভব না হলে অন্য কারো মাধ্যমে

হারামের সীমানায় বকরী জবাই করিয়ে দম দিতে হবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩১০, আলবাহরুর রায়েক ৩/৪০, আললুবাব ফী শরহিল কিতাব ১/২১০, হাশিয়াতুত ত্বহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৭৪২, রদ্দুল মুহতার ২/৫৫৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫৪৫, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/২৬৩, ২৬৯)

আব্দুর রহমান
ফরীদপুর

১১৩ প্রশ্ন : যাকাত সম্পদকে বৃদ্ধি করে কি না? কুরআন-হাদীসের আলোকে জানালে বাধিত হব।

উত্তর : হ্যাঁ, যাকাত সম্পদকে বৃদ্ধি করে। আর এই বৃদ্ধি করার অর্থ হচ্ছে, যাকাতদাতা আল্লাহ তা'আলার হুকুম মেনে যাকাত প্রদান করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদ ও জীবনে প্রচুর বরকত দান করেন। আর তিনি এই বরকত পার্থিব জীবনেও দান করেন এবং পরকালীন জীবনেও দান করেন।

পরকালীন জীবনে বরকত পাওয়াতো স্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেন, 'যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।' (সূরা বাকারা- ২৬১)

আরো ইরশাদ হচ্ছে, 'যারা স্বীয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, আর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার।' (সূরা বাকারা- ২৬২)

আরো ইরশাদ হচ্ছে, 'এমন কে আছে যে আল্লহকে করয দিবে; উত্তম করয? অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন।' (সূরা বাকারা- ২৪৫)

আরো ইরশাদ হচ্ছে, 'যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে, তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগিচার মত, যাতে প্রবল বৃষ্টি হয়, অতঃপর তা দ্বিগুণ ফসল দান করে।' (সূরা বাকারা- ২৬৫)

অনুরূপ হাদীসে এসেছে, 'বান্দা যখন তার উত্তম উপার্জন থেকে সদকা করে তখন আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করে নিজ ডান হাতে গ্রহণ করেন এবং সেটাকে এমনভাবে বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্বশাবক বা উটের বাচ্চাকে প্রতিপালন করে বাড়াতে থাকে।'

আরেক হাদীসে এসেছে, 'মানুষ যখন এক লোকমা পরিমাণ কিছু দান করে, তখন সেটাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে বাড়াতে থাকেন, ফলে এক পর্যায়ে সেটা উহুদ পাহাড়ের সমান হয়ে যায়।'

এ ধরনের বহু আয়াত ও হাদীস দ্বারা বরকত পাওয়ার কথা প্রমাণিত।

ইহকালীন তথা পার্থিব জীবনেও যাকাত আদায়ে সুফল ও উপকারিতা পাওয়া যায়। তবে কখনো হয়তো এর সুফল বাহ্যিকভাবে আমরা দেখতে পাই না, আবার কখনো দেখতে পাই। অর্থাৎ কখনো কারো কারো সম্পদ যাকাত আদায় করার উসীলায় পরিমাণগতভাবেও বেড়ে যায়। আর কারো ক্ষেত্রে অল্প সম্পদেই এতবেশি কাজ করা সম্ভব হয়, যে কাজ অন্য একজন তার দ্বিগুণ সম্পদ দিয়েও সম্পাদন করতে পারে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে যারা যাকাত আদায় করে না, তাদের সম্পদ বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখ, বালামুসীবতে শেষ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যাকাত আদায়কারী এসব সমস্যা থেকে মুক্ত থাকে।

মোটকথা, যারা যাকাত সঠিকভাবে আদায় করে, তাদের জীবনে বিভিন্নভাবে বরকত দেখা দেয়। অনেক সময় সে বুঝতে পারে, অনেক সময় সে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারুক আর নাই পারুক যাকাত আদায়কারী বরকত অবশ্যই পাবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله .

(সূরা বাকারা- ২৬১, ২৬২, ২৪৫, সহীহ বুখারী; হা.নং ১৪১০, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৮৮, মাআরিফুল কুরআন ১/৬৫১)

সুলতানা পারভিন
নরসিংদী

১১৪ প্রশ্ন : আমি একজন চাকুরীজীবি মহিলা। আমার নিম্নবর্ণিত সম্পদ ও নগদ টাকা রয়েছে। প্রতি বছর আমি আমার সম্পদের যাকাত আদায় করে থাকি। কিন্তু যাকাতের হিসাব সঠিক হচ্ছে কি না তা জানা প্রয়োজন। আমি আমার সম্পদের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করছি।

১. স্বর্ণালঙ্কার ২২ ভরি।
২. রৌপ্য ৫ ভরি।
৩. সঞ্চয়পত্র ৪,০০,০০০ (চার লাখ)।
৪. বিবিধ হিসেবে জমা আছে ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার)।
৫. বীমা প্রিমিয়ামে জমা আছে ৩২,০০০ (বত্রিশ হাজার)।

এখন জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত সম্পদের যাকাতের পরিমাণ কত হবে?

উল্লেখ্য, উক্ত সম্পদ ছাড়া ব্যাংক ঋণ ১৪ লাখ ৮২ হাজার টাকা এবং তা থেকে প্রতি মাসে সাড়ে চার হাজার সরকার পক্ষ ভাতা থেকে কর্তন করে। এখন আমার উপর যাকাত আসবে কি না?

আরো উল্লেখ্য যে, আমি সোনালী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মরত আছি।

উত্তর : সোনালী ব্যাংক একটি সুদী ব্যাংক। সুদী ব্যংকে চাকুরী করে বেতন গ্রহণ করা নাজায়েয ও হারাম। তাই আপনার গৃহিত বেতনের টাকাও হারাম। আর হারাম মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না।বরং তা সম্পূর্ণটা সদকা করে দেয়া ওয়াজিব হয়।

কোনো মুসলমান এ জাতীয় সূদী কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরী গ্রহণ করে ফেললে, আর চাকুরী ছেড়ে হালালভাবে চলার ব্যবস্থা না থাকলে, তার কর্তব্য হলো, বৈধ উপায় খোঁজ করতে থাকা আর ইস্তিগফার এর সাথে উক্ত চাকুরী করতে থাকা। সংসার চলার মত বৈধ আয়ের ব্যবস্থা হওয়ার সাথে সাথে উক্ত সুদী চাকুরী ছেড়ে দেয়া তার উপর জরুরী হয়ে যাবে। আর ঐ চাকুরীর মাধ্যমে অর্জিত যাবতীয় অর্থকড়ি সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দেয়া ওয়াজিব হবে। আর ঐ টাকা দিয়ে কোনো জিনিসপত্র কিনে থাকলে সে যদিও ঐ জিনিসের মালিক হয়ে যাবে কিন্তু যতক্ষণ না হালাল ইনকাম থেকে ঐ জিনিসের ক্রয় মূল্য পরিমাণ টাকা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ জিনিস থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয হবে না। এই ভূমিকার পর মূল উত্তর নিম্নে দ্রষ্টব্য-

১. প্রশ্নে উল্লিখিত স্বর্ণালঙ্কার হালাল মাল দিয়ে ক্রয় করে থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থেকে উপহার বা হাদিয়া হিসেবে পেয়ে থাকলে উক্ত স্বর্ণের উপর যাকাত ফরয হবে। তেমনিভাবে রৌপ্যের উপরও যাকাত ফরয হবে।

বর্তমান বাজারে ঐ সোনা-রূপা বিক্রি করতে গেলে যে মূল্য পাওয়া যাবে সেই মূল্যের উপর শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি এসব অলংকার বেতনের টাকায় কিনে থাকেন বা অংশ বিশেষ বেতনের টাকায় কিনে থাকেন, তাহলে বেতনের টাকায় ক্রয় করা অংশ সদকা করে দিতে হবে।

আর সঞ্চয়পত্র, বিবিধ জমা, বীমা প্রিমিয়ামের জমা অর্থ যদি সরাসরি চাকুরীর বেতন থেকে অর্জিত হয়, তাহলে তা হারাম অর্থ হওয়ায় তার উপর যাকাত ফরয হবে না। বরং পুরোটাই সদকা করে দিতে হবে। আর যদি উক্ত অর্থ হালাল উপার্জনের হয়ে থাকে তাহলে শতকরা আড়াই টাকা হারে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

২. প্রশ্নে বর্ণিত ব্যাংক ঋণ হালাল আয় থেকে পরিশোধ করা জরুরী। ব্যাংকে চাকুরীর ভাতা থেকে পরিশোধ করলে সমপরিমাণ হালাল টাকা সদকা করে দিতে হবে। যদি যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে তা পরিশোধ করেন তাহলে প্রত্যেক বছরে আদায়যোগ্য ব্যাংক ঋণ সে বছরের যাকাতের নিসাব থেকে বাদ দিতে হবে। পরবর্তী বছরে আদায়যোগ্য ঋণ চলতি বছরের যাকতাযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ যাবে না। (সূরা বাকারা-২৭৫, ২৭৬, সূরা মায়িদা ২, সহীহ মুসলিম ২/২৭, রদ্দুল মুহতার ২/২৯০, ইমদাদুল আহকাম ৩/৪৫৫, মাসাইলে যাকাত; পৃষ্ঠা ১২৬)

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

১১৫ প্রশ্ন : বদলী হজ্জে যাকে পাঠানো হল সে যদি তিন ফরযের কোন একটা ফরয তরক করে ঘরে ফিরে আসে তাহলে তার দায়ভার কার উপর বর্তাবে এবং এর সমাধান কী হবে?

উত্তর : ফরযসমূহের মধ্য থেকে যেকোনভাবে যদি কোন একটি ফরয ছুটে যায় তাহলে হজ্জ শুদ্ধ হবে না এবং জরিমানা ইত্যাদির মাধ্যমেও সহীহ করা সম্ভব হবে না।

সুতরাং যদি ইহরাম না বেঁধে মীকাতে প্রবেশ করে তাহলে আবার বের হয়ে ইহরাম বেঁধে প্রবেশ করবে বা ভিতরে থেকে ইহরাম বেঁধে নিবে। কিন্তু দ্বিতীয় সূরতে জরিমানা দিতে হবে।

আর যদি উকূফে আরাফা ছেড়ে দেয় তাহলে হজ্জ একেবারেই বাতিল হয়ে যাবে। পরবর্তী বছর পুনরায় হজ্জ করতে হবে। আর চলতি সফরে বদলী হজ্জকারী ওমরার কাজ করে ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

আর যদি তওয়াফে যিয়ারত ছেড়ে দিয়ে হলকের মাধ্যমে হালাল হয়ে থাকে তাহলে সে অন্যান্য জিনিস থেকে হালাল হলেও বিবি হালাল হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ফিরে এসে তওয়াফে যিয়ারত করে ইহরাম থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত না হবে।

বদলী হজ্জ আদায়কারীর গাফলতী ও অবহেলার কারণে যদি ফরয ছুটে যায় এবং হজ্জ বাতিল হয়ে যায় তাহলে এর দায়ভার বদলী হজ্জ আদায়কারীর উপরেই বর্তাবে এবং এ সফরের খরচাদী যা গ্রহণ করেছে তা ফেরত দিতে হবে। আর যদি কুদরতী ওযরের কারণে যেমন রোগ ইত্যাদির কারণে এমনটি হয় তাহলে তার খরচের জরিমানা দেয়া লাগবে না। কিন্তু দমের খরচ সর্বাবস্থায় বদলী আদায়কারীর উপর বর্তাবে। (মানাসিকে মোল্লা আলী ক্বারী; পৃষ্ঠা ৬৮, ৪৫১, আদদুররুল মুখতার ২/৫৭৭, গুনয়াতুন নাসিক; পৃষ্ঠা ৩৩৫, ৩৪৬, ফাতহুল কাদীর ২/৪৬৩, ফাতাওয়া শামী ২/৫১৮, মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ; পৃষ্ঠা ১৭৯)

মু'আমালাত

ইমরান মাহমূদ
দক্ষিণ মনিপুর, ঢাকা

১১৬ প্রশ্ন : উলামায়ে কেরাম হতে শুনেছি, মুফতী শফী রহ. কর্তৃক তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে সূরা হুজুরাতের তাফসীরে আছে ৫/৬টি ক্ষেত্রে গীবত হারাম নয়; বরং প্রকাশ করা জরুরী। সেগুলো কী কী? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অন্যের অগোচরে তার প্রকৃত দোষ বর্ণনার অবকাশ রয়েছে এবং এ সকল ক্ষেত্রে অন্যের দোষ বর্ণনা করা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভূক্ত হবে না।

(১) নির্যাতিতের জন্য নির্যাতনকারীর নির্যাতনের কথা এমন কারো কাছে প্রকাশ করা যে নির্যাতনকারীকে নির্যাতন থেকে নিবৃত রাখতে পারবে বা তাকে নির্যাতন থেকে বাঁচার পন্থা বলে দিবে কিংবা তাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে।

(২) যোগ্য মুফতীর নিকটে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করার সময় প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে অন্যের দোষ বর্ণনা করা।

(৩) এমন ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা যার দ্বারা মুসলমানের দীনী বা দুনিয়াবী অনিষ্টের শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

(৪) পরামর্শ করার সময় প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কারো দোষ প্রকাশ করা।

(৫) যে ব্যক্তি কোন পাপ প্রকাশ্যে করে অথবা নিজের কোন পাপের বিষয় নিজেই প্রকাশ্যে বর্ণনা করে এমন ব্যক্তির ঐ পাপের কথা অন্যরা তার অগোচরে বলতে পারবে।

(৬) পরিচিতির উদ্দেশ্যে অন্ধ, খোড়া, বেঁটে, কালো ইত্যাদি বলা। শর্ত হল, তাকে হেয় করার উদ্দেশ্যে না হতে হবে। (তাফসীরে রুহুল মা'আনী ১৩/২৪১, নযরাতুন নাঈম; নং ৫১৬৪ [গীবত], মা'আরিফুল কুরআন ৮/১২৩)

শে. মু. আব্দুর রহীম
বসিলা রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

১১৭ প্রশ্ন : মোনছোপ মোল্লার ৬ ছেলে ও ২ মেয়ে। সকলেই জীবিত, শুধুমাত্র স্ত্রী মৃত। তিনি মৃত্যুর প্রায় ১০ বছর আগে হজ্জে যাওয়ার পূর্বে তার ৫টি দোকানের জমি ৬ ছেলেকে তার মৃত্যুর পর কার্যকর সাপেক্ষে সমান অংশে পৃথক দলীল করে দেন। কিন্তু দলীল বা দোকানের জমির দখল ভিন্নভাবে বুঝিয়ে দেননি। সকল দলীল বড় ছেলের কাছে ছিল। মোনছোপ মোল্লা জীবিতাবস্থায় ১টি দোকানের ভাড়া নিজে গ্রহণ করতেন। আর বাকী ৪টি দোকান ছেলেদের ভোগ দখলের জন্য দিয়েছেন। সে দোকানের ভাড়া ছেলেরা বণ্টন করে নিত। ছেলেদের নামে দলীল করার কথা ও মেয়েদেরকে এর বদলে ফসলী জমি দেয়ার কথা সকলকে মৌখিক জানিয়ে দেন। কিন্তু মেয়েদের দলীল করে বা দখল বুঝিয়ে দেননি। মোনছোপ মোল্লা প্রায় ৪ বছর পূর্বে মারা গেছেন। এ পর্যন্ত সকল ভাই মিলিতভাবে দোকানগুলোর ভাড়া ভোগ দখল করে আসলেও বর্তমানে তাদের মধ্যে দলীল অনুযায়ী বণ্টিত সকল অংশের উপযোগিতা সমান না হওয়ায় ও দলীলে উল্লিখিত চৌহদ্দির সাথে বাস্তবের মিল না থাকায় দলীল অনুযায়ী বণ্টন ও দখল নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় আমার জানার বিষয় হল, পিতার উক্ত বণ্টন সঠিক হয়েছে কিনা? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এখন করণীয় কী? এ বিষয়ে শরয়ী ফয়সালা জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মোনছোপ মোল্লা জীবদ্দশায় তার ৬ ছেলের নামে ৫টি দোকানের জমি দলীল করে মৃত্যুর পর মালিক হওয়ার অসিয়ত করেছেন। শরীয়ত মতে ওয়ারিশের জন্য

অসিয়ত সহীহ নয়। কাজেই এ দলীলের কারণে ছেলেরা উক্ত ৫টি দোকানের মালিক হবে না। তবে যে ৪টি দোকানের ভাড়া পিতার জীবদ্দশায় ছেলেরা যৌথভাবে ভোগ করত তা যদি পিতা কর্তৃক তাদেরকে মৌখিকভাবে দান করা হয়ে থাকে এবং সে সূত্রেই তারা ভাড়া উঠাতে থাকে তাহলে এ ৪টি দোকানের মালিক ছেলেরা হবে আর বাকী ১টি দোকানসহ সকল সম্পদ ছেলে-মেয়ে সকল সন্তান ফারায়েয মতে অংশীদার হবে। দান সূত্রে মালিক হোক চাই মীরাস সূত্রে সর্বাবস্থায় অংশীদারগণ চাইলে নিজ পরামর্শের মাধ্যমে নিজ নিজ সুবিধামত আপোষ বণ্টন করে নিতে পারবে, এতে শরীয়ত মতে কোন বাধা নেই।

উল্লেখ্য, পিতা যদি জীবদ্দশায় ৪টি দোকান ছেলেদেরকে দিয়ে থাকেন আর কোন কারণ ছাড়াই মেয়েদেরকে তার বিপরীতে কিছুই না দিয়ে থাকেন তাহলে তাতে পিতা গুনাহগার হবেন। পিতাকে গুনাহগার হওয়া থেকে বাঁচাতে চাইলে ছেলেরা উল্লিখিত দোকানসমূহের মালিকানা জমি স্বেচ্ছায় ফেরত দিয়ে সকল সম্পত্তি ফারায়েয অনুপাতে বণ্টন করে নিতে হবে। (সূরা বাকারা- ২৮২, রদ্দুল মুহতার ৬/৬৪৭, সুনানে কুবরা বাইহাকী ৬/৯৯, আদদুররুল মুখতার ৫/৬৯০, রদ্দুল মুহতার ৫/৬৯৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৪১৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/২৫৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৪৭১)

হাসান

মোমেনশাহী

১১৮ প্রশ্ন : (ক) আমি একজন বই ব্যবসায়ী। বিভিন্ন বই ফটোকপি সংস্করণও বিক্রি করে থাকি। অনেক ক্ষেত্রে কিছু দুর্লভ বইয়ের পর্যাপ্ত সংখ্যক কপি পাওয়া যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে বইটি 'আউট অব প্রিন্ট'-ও হয়ে থাকে। অনেক বই বহু বছর আগে মুদ্রিত যার নতুন সংস্করণ পাওয়া যায় না। কোন কোন বই কেবল কলকাতায়ই মুদ্রিত হয়। আর বাংলাদেশে খুব সামান্য সংখ্যক কপি আসে।

এ সকল ক্ষেত্রে আমি ফটোকপি করে বিক্রি করে থাকি, যা উক্ত বইসমূহের কপিরাইটের লঙ্ঘন। এমতাবস্থায় এ ধরনের বিক্রি আমার জন্য জায়েয কিনা? সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিস্টার ছয় মাস। এক্ষেত্রে আইনানুগ পন্থায় অনুমতি গ্রহণ বা নির্দিষ্ট প্রকাশক কর্তৃক পুনঃমুদ্রণ কিংবা কলকাতা থেকে আনা খুবই সময় সাপেক্ষ। ছয় মাসে হওয়ার কথা তো নয়ই, এমনকি কখনোই না হতে পারে। এক্ষেত্রে করণীয় কি?

(খ) তাবলীগী সফরে আমরা অনেকে মসজিদে যাই। অনেক সময় সেখানে দু'আ, মীলাদ ইত্যাদির পর মিষ্টি জিলাপী ইত্যাদি দেয়া হয়। কখনো উপলক্ষ থাকে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ, কখনো অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা কামনা, আবার কোন সময় তা হয় নবজাতকের জন্ম, চাকুরী প্রাপ্তি ইত্যাদির সুসংবাদ।

সাধারণত পুরো জামাআতের জন্য মিষ্টির প্যাকেট তারা আলাদা করে দিয়ে যায়। এ মিষ্টির ব্যাপারে করণীয় কি?

উল্লেখ্য, সরাসরি ফেরত দিতে গেলে অনেক সময় সমালোচনা-হট্টগোলের সম্ভাবনা থাকে।

উত্তর : (ক) বই-পত্রের প্রকাশনা স্বত্ব প্রকাশনার জগতে একটি স্বীকৃত অধিকার। রাষ্ট্রীয় আইন ও শরীয়তেও এ অধিকার স্বীকৃত। কাজেই যে বইয়ের স্বত্ব সংরক্ষিত থাকে সে বই লেখক বা প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত কপিরাইট লঙ্ঘন করে হুবহু ফটোকপি অথবা নামমাত্র কিছু পরিবর্তন করে প্রকাশ করা জায়েয নেই। কারণ, এর দ্বারা প্রকাশকের হক নষ্ট হয় এবং ব্যবসায়ও ক্ষতি করা হয়, যা স্পষ্ট খিয়ানত। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা নাজায়েয।

তবে যদি কোন বই লেখক বা প্রকাশক কর্তৃক বাজারজাত করা বন্ধ হয়ে যায় বা অন্য দেশ হতে লেখক বা প্রকাশক কর্তৃক এক্সপোর্ট না হয়ে থাকে তাহলে কেবল সেক্ষেত্রে সীমিত পর্যায়ে ফটোকপির মাধ্যমে বাজারজাত করা যেতে পারে। কারণ, এক্ষেত্রে নাজায়েয হওয়ার মূল কারণ প্রকাশক বা লেখককে ক্ষতিগ্রস্থ করার বিষয়টি অনুপস্থিত। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১২১২, ১২১৩, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৩১৬৯, আদদুররুল মুখতার ৬/২০০, আলমউসূআতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ৬/২৩৭, বুহুসুন ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মু'আসারা ১/১২২, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/২২০, জাদীদ ফিকহী মাসাইল ৩/৮৪, ফিকহী মাকালাত ১/২২৪)

(খ) যদি কোন ব্যক্তি নবজাতকের জন্ম, চাকুরী প্রাপ্তি, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল, ব্যবসায় উন্নতি এ জাতীয় পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে নামাযের পরে সম্মিলিতভাবে দু'আ করান এবং দু'আর পরে মিষ্টান্ন বিতরণ করেন তাহলে তা গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় জায়েয।

পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করিয়ে খানা, মিষ্টি ইত্যাদি খাওয়ানোর হুকুম হল, যদি বিনিময় হিসেবে খাবার মিষ্টান্ন ইত্যাদি খাওয়ানো হয় তাহলে তা নাজায়েয হবে। আর বিনিময় হিসেবে না হলেও এটা একটা ভুল প্রথা এবং বিনিময়ের সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ। এজন্য এমন খাবার ও মিষ্টান্ন বিতরণ ও গ্রহণ না করতে পারলেই ভালো। তবে ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য গ্রহণ করতে হলে তার সুযোগ অবশ্যই থাকবে। কারণ ফিতনা তার চেয়েও খারাপ কাজ। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৬৯৭, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৬১২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৩, আলহিদায়া ৫/৪৪৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৪/১২৭, ইমদাদুল আহকাম; পৃষ্ঠা ২০৬)

বিবাহ-তালাক

মুহাম্মাদ ঈমান আলী

বেড়ীবাঁধ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

১১৯ প্রশ্ন : আমি ২০১৩ সালে বিবাহ করি। গত কিছুদিন পূর্বে আমার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয় এবং আমি তাকে মারধর করি। একপর্যায়ে আমি তাকে বলি যে, 'তোমাকে আর রাখবো না, তুমি এক তালাক, দুই তালাক, তোমার মা-সহ তিন তালাক'।

এখন আমরা উভয়ে একসাথে সংসার করতে চাই। মুফতী সাহেবের নিকট এর শরয়ী সমাধান কাম্য।

উত্তর : প্রত্যেক বিবাহ ও বিবাহ ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য বিবাহ, তালাক এবং স্বামী-স্ত্রীর হক সংক্রান্ত মাসাইল জেনে নেয়া ফরযে আইন। এ ফরযের প্রতি অবহেলা করা বড় গুনাহের কাজ। জরুরী মাসাইল না জানার কারণে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে দাম্পত্য জীবনে চরম সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

ইসলামী শরীয়তে বৈধ কাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের বৈধ কাজ তালাক দেয়া। দাম্পত্য জীবনের কোন সংকটময় অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শরীয়তে তালাকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর সংকট নিরসনের জন্য এক তালাকই যথেষ্ট। তাই একসাথে একাধিক তালাকা দেয়া গুনাহের কাজ। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি তার স্ত্রীকে একসঙ্গে একাধিক তালাক দেয় তাহলে শরীয়ত মতে একাধিক তালাকই পড়বে; এক তালাক নয়।

অতএব, আপনার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে আপনার কথা 'তোমাকে আর রাখবো না, তুমি এক তালাক, দুই তালাক,

তোমার মা-সহ তিন তালাক' এর মাধ্যমে শরীয়ত মতে আপনার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়েছে। তাই আপনার জন্য আপনার স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। শরয়ী হালালা ব্যতীত এ স্ত্রীকে নিয়ে আপনার পুনরায় বৈধভাবে ঘর সংসার করার কোন অবকাশ নেই।

শরয়ী হালালার সূরত

আপনার স্ত্রী তিন তালাকের ইদ্দত পালন শেষে তথা তালাকের পর পূর্ণ তিনটি হায়েয অতিক্রান্ত হওয়া বা গর্ভবতী হলে গর্ভপ্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করে বিবাহের সকল শর্ত অনুযায়ী অন্যত্র বিবাহ বসবে। বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাসের পর দ্বিতীয় স্বামী যদি স্বেচ্ছায় তাকে তালাক দেয় বা মৃত্যুবরণ করে তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দত পালন শেষে আপনি ও আপনার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী সম্মত থাকলে বিবাহের সকল শর্ত বজায় রেখে উভয়ে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার করতে পারবেন। (সূরা বাকারা- ২২৯, সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৯৬১, ৫২৫৯, ৫২৬১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৪৩৩, ফাতাওয়া শামী ৩/২৪৮, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৯/৩১৯)

বিবিধ

মুফতী রুহুল আমীন
মাদরাসা-ই আনওয়ারুল উলূম, হাজারীবাগ বটতলা, ঢাকা

১২০ প্রশ্ন : মাদরাসা-ই আনওয়ারুল উলূম ১৫২/২ হাজারীবাগ বটতলা, ঢাকা-এর নিজস্ব জায়গায় মাদরাসার প্রয়োজনে ও মহল্লাবাসীর নামাযের সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষ নিচে মসজিদ উপরে মাদরাসা বানানোর চিন্তা-ভাবনা করেছে। আমার জানার বিষয় হল, এভাবে নিচে মসজিদ রেখে উপরে মাদরাসা বানানো শরীয়ত মতে জায়েয হবে কিনা?

উল্লেখ্য, *আহসানুল ফাতাওয়া* কিতাবে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রয়োজনে এরূপ করা জায়েয হবে। সুবিধার জন্য এখানে উল্লেখ করা হল।

উত্তর : মাদরাসার জায়গায় মাদরাসার প্রয়োজনে মসজিদ করতে কোন সমস্যা নেই। উপর নিচে যেকোন তলা মসজিদের জন্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। একবার মসজিদ হিসেবে কোন তলাকে নির্ধারণ করে নামায শুরু করে দিলে সে তলা শরয়ী মসজিদ হয়ে যাবে এবং তাতে মসজিদের সকল হুকুম প্রযোজ্য হবে।

উল্লেখ্য, মসজিদের জায়গায় একবার মসজিদ নির্মাণ হয়ে গেলে তার উপরে বা নিচে কোন তলা মাদরাসা বানানো জায়েয নেই। কারণ নিচে সম্পূর্ণ শরয়ী মসজিদ হয়ে গেছে।

আহসানুল ফাতাওয়ার মাসআলাটি মাদরাসার জায়গায় মসজিদ বানানো প্রসঙ্গে নয়; বরং মসজিদের জায়গায় মসজিদ বানানোর সময় তার উপরে বা নিচে কোন স্থানকে অন্য কোন দীনী কাজের জন্য নির্ধারণ করা প্রসঙ্গে। (আলবাহরুর রায়েক ৫/৩৫৬, রদ্দুল মুহতার ৪/৩৬৭, তাবয়ীনুল হাকায়িক ৪/২৭২, আননাহরুল ফায়িক ৩/৩৩০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৩/১০৩, জাওয়াহিরুল ফিকহ ৩/১৩৪)

মুসল্লীদের পক্ষে
জাফর আহমাদ

১২১ প্রশ্ন : আমাদের জামে মসজিদের নতুন কমিটি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, ইমাম, মুআযযিন দৈনিক হাজিরা খাতায় দস্তখত করবেন। এখন অনেকের প্রশ্ন, ইমাম যদি অন্যান্য অফিসের মত হাজিরা দিতে হয় তবে সেতো একজন কর্মচারী বা গোলাম হয়ে গেল। এখন একজন কর্মচারী বা গোলামকে ইমাম বানিয়ে তার পিছনে ইক্তিদা করা শরীয়ত সমর্থন করে কিনা? আমরা কুরআন-হাদীসের আলোকে সুস্পষ্ট সমাধানের অনুরোধ করছি।

উত্তর : ইমামতি করা ও আযান দেয়া বিশেষ ফযীলতপূর্ণ ইবাদত। বেতনভোগী ইমাম ও মুআযযিনের কাজ ইবাদত হওয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও বটে। যে দায়িত্বের প্রতি তাদের নিজেদের সচেতনতা থাকতে হবে মুসল্লী বা কমিটির তুলনায় অনেক বেশি। দুর্ঘটনাক্রমে মাঝে মধ্যে দায়িত্ব পালন করতে না পারলে সেটা নিয়ে মুসল্লী বা কমিটির পক্ষ হতে বাড়াবাড়ি জায়েয হবে না বা এর জন্য হাজিরা খাতা খোলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কোন ইমাম বা মুআযযিনের নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেলা যদি অভ্যাসে পরিণত হয়, সতর্ক করার পরও যদি সতর্ক না হয় তাহলে তাদের জন্য হাজিরা খাতায় দস্তখতের ব্যবস্থা করতে সমস্যা নেই। এতে তাদের গোলাম হওয়ার কথাটি ঠিক নয়। আর বেতনভোগী হলে তো তারা মূলত কর্মচারী হবেন। তবে কমিটি বা মুসল্লীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার ঘরের কর্মচারী। সুতরাং তাদের পিছনে ইক্তিদা করতে কোন সমস্যা নেই।

মোটকথা, শৃঙ্খলার স্বার্থে হাজিরা খাতায় দস্তখতের ব্যবস্থা করতে হলেও তাদের সাথে অসম্মানজনক আচরণ করা যাবে না। আর সম্মানজনকভাবে দস্তখতের ব্যবস্থা করা হলে তাদের পিছনে ইক্তিদা করতে কোন সমস্যা নেই। (সূরা ইসরা- ৩৪, আলবাহরুর রায়েক ৫/৩৮১, ফাতাওয়া শামী ৪/৪১৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া)

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
উত্তরা, সেক্টর-৭, ঢাকা

১২২ প্রশ্ন : আমি একজন এফসিপিএস ডাক্তার। আমি যে বিষয়ে এফসিপিএস করেছি সে বিষয়ের উপর একটি কলেজে ক্লাস নিই। ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রী উভয়ই থাকে। এখন আমার প্রশ্ন হল, এ ধরনের ক্লাস নেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে আমার জন্য বৈধ হবে কিনা?

উত্তর : পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পর্দাকে ফরয করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য যেমন গাইরে মাহরাম (বেগানা) মহিলাদেরকে দেখা এবং তাদের সাথে বেপর্দা কথা বলা সম্পূর্ণ হারাম, তেমনিভাবে মহিলাদের জন্যও বেপর্দাভাবে গাইরে মাহরাম পুরুষদের সম্মুখে যাওয়া ও তাদের সাথে কথা বলা হারাম।

সুতরাং বালেগ ছেলে-মেয়েদের জন্য একই শ্রেণীকক্ষে বসে শিক্ষার্জন যেমন শরীয়ত মতে অবৈধ, তদ্রূপ এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে পড়ানোও অবৈধ। কারণ, তা একদিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানের সুস্পষ্ট বিরোধিতা। অপরদিকে তা পুরুষের আত্মমর্যাদা ও নারীর সম্ভ্রমের পরিপন্থী।

পর্দাহীনভাবে সহশিক্ষার এ পদ্ধতি ইংরেজরা কৌশলে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য চালু করেছিল। ফলে এর দ্বারা সমাজে নানাবিধ সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। যুবক-যুবতী একজন অপরজনের দিকে উপভোগের দৃষ্টিতে তাকানো, অবৈধ সম্পর্ক, অপহরণ, খুন ও ধর্ষণের মত লোমহর্ষক ঘটনা এ শিক্ষারই অশুভ পরিণতি।

অতএব ইংরেজদের ধ্বংসাত্মক ফাঁদে পা রেখে নিজেদের দীন-দুনিয়া উভয়টাকে হুমকির মুখে ফেলা কি করে বৈধ হতে পারে! অবশ্য পড়ানোর বেতন হালাল হবে। কেননা বেতন হয় পড়ানোর বিনিময়ে; বেপর্দেগীর বিনিময়ে নয়। (সূরা নূর- ৩০, সূরা আহযাব- ৫৯, সূরা মায়িদা- ২, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১৭৩, সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২১৪৯, ৪১১২, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ২/২২৭, ২২৯, রদ্দুল মুহতার ১/৪০৬, ফাতাওয়া আলমারআতুল মুসলিমা ২/৫৯, ৬০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৬/৭, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/২৫, আউরাত কী ইসলামী যিন্দেগী আওর জাদীদ সায়েন্সী তাহকীকাত; পৃষ্ঠা ৪৭৫)

দিয়ানতদার ছাত্রের জন্য নিগরানের প্রয়োজন নেই

মুফতী সাঈদ আহমাদ

চলতি শিক্ষা বছরের শুরুতে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া'য় ছাত্রদের কানুন শুনানীর মজলিস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে মজলিসে ভর্তিফরমে উল্লিখিত দশটি অঙ্গীকারনামার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণের অনুলিখন এটি। সকল তালিবে ইলমে দীনের জন্য উপকারী হবে মনে করে তা এ সংখ্যায় ছাপা হল। -সম্পাদক

হামদ ও সালাতের পর ...

এটা তোমাদের ভর্তি ফরমের অঙ্গীকারনামা। এ অঙ্গীকারনামায় তোমরা স্বাক্ষর করে ভর্তি হয়েছো। অঙ্গীকারের সম্পর্ক দিয়ানতের সাথে। দিয়ানতের অর্থ তোমার ও তোমার প্রভুর সাথে সম্পর্ক। তোমাদের মাঝে যদি দিয়ানতদারী থাকে তবে এ অঙ্গীকারনামার প্রতি আস্থা রাখা যাবে এবং মু'তামাদ আলাইহি হবে। আর যদি দিয়ানতদারী না থাকে তাহলে এটা মু'তামাদ আলাইহি হবে না, এটার উপর আস্থা রাখা যাবে না। আর ফী-মা বাইনাহু ওয়া বাইনাল্লাহ যখন ঠিক হয়ে যায় তখন ফী-মা বাইনাহু ওয়া বাইনান্নাসও ঠিক হয়ে যাবে, সাথে সাথে সেটা মু'তামাদ আলাইহিও হবে, তার উপর আস্থা রাখা যাবে। তো অঙ্গীকারনামার সম্পর্ক হল তোমাদের নিজের সাথে। তুমি যে অঙ্গীকার করেছো তার সুরক্ষা হয়েছে কি না এ ব্যাপারে তোমাকে আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যদি কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ কর আর তোমার নেগরান (তত্ত্বাবধায়ক) বা সাথী-সঙ্গীরা তা অবগত না হয়, তা সত্ত্বেও এর জন্য তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহিতার মুখোমুখি হবে। কারণ তুমি ওয়াদা করেছো যা অলঙ্ঘ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেই দিয়েছেন, إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (অর্থ) নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, তুমি যে ওয়াদা করেছিলে তা ঠিক রেখেছো কি না।

একজন মানুষের যখন দিয়ানতদারী ঠিক হয়ে যায় তখন তার তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন হয় না। তখন তার তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। নির্জন স্থানেও সে কোন অন্যায় করবে না, অঙ্গীকারের খেলাফ করবে না। আর জনসম্মুখেও সে করবে না কোন খেয়ানত।

উলামায়ে কেরামের মধ্যে যদি দিয়ানতদারী না আসে, সর্বোপরি বাছাইকৃত উলামায়ে কেরাম– যাদেরকে ফুকাহা বলা হয় এবং যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাফাক্কুহ ফিদ-দীন তথা দীনের নিগূঢ় বুঝ দান করেছেন বা করবেন– তাদের মধ্যে যদি দিয়ানতদারী না থাকে, তাহলে তা নিতান্তই দুঃখজনক ব্যাপার।

আদ-দুররুল মুখতারের ভূমিকায় হযরত হাসান বসরী রহ.-এর বরাতে ফকীহের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে যে, ফকীহ তিনি যার সব দিক ঠিক থাকবে এবং যিনি হবেন দুনিয়া-বিরাগী ও আখেরাত-অনুরাগী। নিজের ত্রুটি দেখবে। নিজ প্রভুর ইবাদতে মগ্ন থাকবে। খোদাভীরু হবে, মুসলমানদের ইজ্জত-আব্রুর হিফাযত করবে, জনগণের সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হবে না এবং উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষী হবে। মোটকথা, ফকীহ হওয়ার জন্য যুহদ ও তাকওয়া অর্থাৎ দুনিয়া বিমুখতা ও খোদাভীতি অত্যন্ত জরুরী।

বলছিলাম, যদি কারো মধ্যে দিয়ানতদারী চলে আসে, তাহলে এ অঙ্গীকারনামা বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না এবং সে এর খেলাফও করবে না। সুতরাং যদি কারো থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অঙ্গীকারের খেলাফ কাজ প্রমাণিত হয় তাহলে বুঝতে হবে, তার মধ্যে ফকীহ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত দিয়ানতদারী অনুপস্থিত। এ ব্যক্তি ফকীহ হওয়া তো দূরের কথা, সাধারণ নেককার হওয়ারও যোগ্যতা রাখে না। হাদীসে এসেছে,

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد.

অর্থ : একজন ফকীহ শয়তানের মুকাবেলায় হাজারজন আবেদের চেয়ে বলিষ্ঠ।

ভালো করে বোঝো, হাদীসে বলা হয়েছে, একজন ফকীহ হাজারজন আবেদের চেয়ে উত্তম। আবেদ অর্থ কী?। আবেদ অর্থ হল, যে ব্যক্তি তার নিজের উপর অর্পিত ইবাদত-বন্দেগী ঠিকঠিক আদায় করে। বোঝা গেল, আবেদ সাহেব একজন ভালো মানুষ। তাহলে হাদীসের মর্ম দাঁড়াল, একজন সাধারণ নেককার ব্যক্তির চেয়ে একজন ফকীহ হাজার গুণে ভালো এবং শয়তানের বিপরীতে বলিষ্ঠ; সাধারণ জনগণের চেয়ে নয়। এ যুগের যেসব সাধারণ মানুষ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাঁচ ওয়াক্তই পড়ে না, পড়লেও দু-এক ওয়াক্ত পড়ে কিংবা নামায পড়লে রোযা রাখে না, রোযা রাখলে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না, পর্দা-পুশিদার তো বালাই-ই নেই– এদের হাজারজন নয় বরং শরীয়তের পরিভাষায় যাদেরকে আবেদ বলা হয়, যাদের ইবাদত-বন্দেগী তথা ব্যক্তিগত দীনদারী পরিপূর্ণরূপে ঠিক আছে– শয়তানের বিপরীতে এরূপ হাজার ব্যক্তির চেয়ে একজন ফকীহ উত্তম। কিন্তু যদি কোন ফকীহর মধ্যে দিয়ানতদারীই না থাকে, বিশ্বস্ততা না থাকে তাহলে কিন্তু সে একজন আবেদেরও মর্যাদা লাভ করবে না। সে আবেদেরও নিচের স্তরে নেমে যাবে। কেননা হাদীসে বদদীন বা দিয়ানতদারী নেই এমন আবেদের কথা বলা হয়নি। সুতরাং আমাদেরকে দিয়ানতদারীর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

কানুন প্রণয়ন করা বা শোনানো তো নিছক একটা নিয়ম রক্ষার ব্যাপার। নচেৎ একজন সচেতন ব্যক্তি যে কিনা একেবারে শুরু থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত পড়ে এসেছে, তারপর উচ্চতর ইলমে দীন হাসিল করার জন্য তাখাসসুসে ভর্তি হয়েছে, এমন ব্যক্তির জন্য অঙ্গীকারনামা তৈরি করে দেয়া তো দূরের কথা তার ব্যাপারে এর চিন্তা করাও ঠিক নয়। কারণ অঙ্গীকারনামা তো সে নিজেই তৈরি করবে। নিয়ম-কানুন তো এখন সে-ই প্রস্তুত করার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু তারপরও নিয়ম রক্ষার খাতিরে প্রতিষ্ঠানকে এটা করতে হয়। কারণ সবক্ষেত্রেই ভালোদের সঙ্গে কিছু কিছু মন্দলোকও জুড়ে যায়। যারা নিজেরাও বঞ্চিত হয়, অন্যদের জন্যও কষ্ট ও বিরক্তির কারণ হয়। এদেরকে সংশোধন করার জন্য কিংবা এদের ও ভালোদের মাঝে পার্থক্য করার জন্য কিছু নিয়ম-কানুন ও অঙ্গীকারনামার প্রয়োজন হয়।

আমরা আশা করব, তোমরা যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছো, তা শুধু নিয়ম রক্ষার্থেই করেছো। নতুবা তোমাদের সকলেরই অবস্থা এই যে, তোমাদের

নিকট থেকে এ অঙ্গীকার না নিলেও চলতো। মনে রাখতে হবে, এ অঙ্গীকারনামায় যা কিছু লেখা হয়েছে সব তোমারই স্বার্থে। তোমার পড়ালেখা বা এ দু'বছরের সময় যেন নষ্ট না হয়, তোমার অর্জন যেন সঠিকভাবে হয় সেজন্যই এ অঙ্গীকারনামা। এটা নতুন করে বলে দেয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। তুমি নিজেই এ সকল ক্ষতিকর জিনিস থেকে বিরত থাকতে এবং উপকারী বিষয়গুলো খুঁজে নিতে।

তোমরা ফী-মা বাইনাহু ওয়াবাইনাল্লাহ, ফী-মা বাইনাকা ওয়াবাইনাল্লাহ এবং ফী-মা বাইনাকুম ওয়াবাইনাল্লাহ এই তিন শ্রেণীর মুআমালাত ঠিক রাখবে। মনে করো, এক ব্যক্তি নামায পড়িয়েছে, কিন্তু তার উযূ ছিল না কিংবা নামাযের মাঝে তার উযূ ছুটে গেছে। মুসল্লিরা কিন্তু এটা জানে না, জানা সম্ভবও নয়। এখন এ ব্যক্তি মুসল্লিদেরকে নামাযটি দ্বিতীয়বার আদায় করার জন্য তখনই বলার সৎসাহস দেখাবে যখন তার মধ্যে দিয়ানতদারী থাকবে। সে যদি চায়, আল্লাহ তা'আলা ও তার মাঝের সম্পর্কটি অটুট থাকুক তাহলে সে মসজিদে ঘোষণা করবে যে, আপনাদের গতকালের অমুক নামাযটি দ্বিতীয়বার আদায় করতে হবে। আর যদি তার মধ্যে এই ভয় না থাকে তাহলে সে ঘোষণা করবে না। কেননা তার উযূ ছিল নাকি ছিল না, উযূ ভেঙ্গে গেছে নাকি ঠিক আছে– এ ব্যাপারে মুসল্লিরা অবগত নয়। উপরন্তু উযূ ছিল না উল্লেখ করে মুসল্লিদেরকে নামায দোহরাতে বলা হলে তার বদনামেরও আশঙ্কা আছে যে, এ আবার কি রকম হুযূর, উযূ ছাড়াই নামায পড়িয়েছে! ইত্যাদি, ইত্যাদি। তো সে মনে মনে ভাববে, পাবলিকের সাথে তো আমার সম্পর্ক ঠিক আছে। তারা তো জানে যে, আমি নামায পড়িয়েছি; আমার জন্য এতটুকু ঠিক থাকলেই যথেষ্ট। ফলে সে আর নামায দোহরানের ঘোষণা করবে না। এটা সে ঐ সময় করবে, যখন তার মধ্যে তার আর আল্লাহ তা'আলার মাঝের সম্পর্কটির গুরুত্ব বিদ্যমান থাকবে না। বরং এ ক্ষেত্রে সে তার আর মানুষের মধ্যের সম্পর্কটিকে প্রাধান্য দিবে।

সুতরাং আলেমে দীনের জন্য, বিশেষ করে যারা এমন আলেমে দীন হতে চায় যাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের ফয়সালা করেছেন, তাদের এ বিষয়টি সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে যে, তার আর আল্লাহ তা'আলার মাঝের সম্পর্কটি যেন শতভাগ ঠিক থাকে; ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ শ্রেণীর আলেমে দীনকে প্রতিটি কাজেই খেয়াল রাখতে হবে যে, তাকে একদিন এ কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব দা.বা. বলেন, আমাদের মরহুম পিতা হযরত মুফতী শফী সাহেব রহ. বলতেন, তুমি কারো দোষ বর্ণনার পূর্বে এ কথা চিন্তা করে নিবে যে, একদিন তোমাকে এ বিষয়টি আহকামুল হাকিমীনের দরবারে প্রমাণ করতে হবে। কাজেই তোমার নিকট যদি তেমন প্রমাণাদি আর আস্থা থাকে তাহলে তুমি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ বা সমালোচনা করতে পারো। আর যদি তোমার কাছে আহকামুল হাকিমীনের নিকট প্রমাণ করার মত তথ্য-উপাত্ত না থাকে তাহলে তুমি কারো দোষ বর্ণনা করতেও যেও না; দেখতেও যেও না।

সারকথা হল, তোমাদের মধ্যে দিয়ানতদারী যেন ঠিক থাকে। প্রত্যেক কথা বা কাজের মধ্যে খেয়াল রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দেখছেন। অর্থাৎ তোমার নেগরান হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহকে যদি ফাঁকি দেয়া সম্ভব হয় তাহলে ফাঁকি দিও। বস্তুত এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই একটি বিষয় যদি তোমরা আত্মস্থ করতে পারো তাহলে আল্লাহর পরে তোমার জন্য আর হুযূরদের নেগরানীর প্রয়োজন হবে না, ইনশাআল্লাহ। এখন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ প্রণীত কানুনসমূহ শোনানো হচ্ছে।

১. মাদরাসার বর্তমান ও ভবিষ্যতে গৃহিত সকল আইন-কানুন অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে সচেষ্ট থাকিব।

অর্থাৎ বিস্তারিত আইন-কানুন যেগুলো তোমাদেরকে শুনানো হবে সেগুলো পালনে সচেষ্ট থাকবে।

২. দরস, মুতালাআ ও তাকরার ব্যতীত অন্য কোন শোগল এখতিয়ার করিব না।

দরস, মুতালাআ ও তাকরার ব্যতীত তোমাদের আর কোন কাজই নেই। যদি থাকে এবং মাদরাসা-কর্তৃপক্ষ তোমাকে তা করতে বলে তখন সেটা সানন্দে আঞ্জাম দিবে। তোমরা এখানে এসেছো পড়াশোনা করার জন্য এবং এটাই তোমাদের একমাত্র কাজ। বহু ছাত্র এমনও আছে, যাদের দেখে মনে হয়, তাদের মূল কাজ হল মাদরাসার বাইরে। এরা যখন মাদরাসায় অবস্থান করে তখন বুঝতে হবে, এখন আর বাইরে কোন কাজ নেই বিধায় সে মাদরাসায় আছে। যারা সময় থাকতেও মুতালাআ করে না, সবক ইয়াদ করে না তারাই এ শ্রেণীর লোক যে, কোন কাজ নেই বলে মাদরাসায় থাকে। আর না হয় কাজ পেলেই সোজা মাদরাসার বাইরে, মার্কেটে, নয় তো বাড়িতে। এরা ছুটি চাইতে এসে বলে, হুযূর! বাড়িতে একটা কাজ আছে! অর্থাৎ এ কয়দিন এখানে কাজ ছিল না বিধায় অবস্থান করছিল। আশা করব তোমরা এদের মত হবে না।

৩. সর্বদা সুন্নাত তরীকা মোতাবেক আদর্শ জীবন যাপন করিব।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আমরাই যদি সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী না চলি, তাহলে সাধারণ জনগণ কিভাবে সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী জীবন যাপন করবে। জীবন যাপন করার জন্য মানুষ বাস্তব নমুনা চায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তব নমুনা হিসেবে সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-কে রেখে গেছেন। সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যামানায় উম্মতের বাস্তব নমুনা হল উলামায়ে কেরাম। তাহলে যেসব দেশে উলামায়ে কেরামই দাড়ি কাটে সেসব দেশের সাধারণ জনগণ কিভাবে দাড়ি রাখবে? উলামায়ে কেরামের প্রতিটি কাজ কেউ না কেউ অনুসরণ করে। এজন্য উলামায়ে কেরামের সকল কাজ কষ্টসাধ্য হলেও সুন্নাত অনুযায়ী হওয়া জরুরী। সুন্নাতের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় এ রকম ছাড় থাকে যে, সেটা না করলেও সমস্যা হয় না, সেক্ষেত্রেও উলামায়ে কেরামের জন্য সুন্নাত তরক করা অনুচিত। বরং যেহেতু তার সকল কাজ সাধারণ জনগণ অনুসরণ করবে এজন্য কষ্টকর হলেও তাকে সুন্নাতের উপর বহাল থাকা উচিত। তোমরা জানো, আমাদের বুযুর্গানে দীন ইবাদাত-বন্দেগীর উপর, নফলের উপর কতটা পাবন্দ ও মজবুত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও এগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

৪. সর্বদা নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিব এবং আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখিব। মাথার চুল ও হাত পায়ের নখ খাটো রাখিব, দাড়ি কখনো উপড়াইব না, এক মুষ্ঠির ভিতরে ছাটিব না বা কাটিব না।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা পয়সা-কড়ি বা মালদারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। এটা স্বভাবের বিষয়। স্বভাবের মধ্যে যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকে তাহলে বাইরেটাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে।

দামী কাপড় পরিধান করা জরুরী নয়; কিন্তু যেটা পরিধান করবে সেটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, উলামায়ে কেরামকে মানুষ অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং যদি পোশাক-আশাক অপরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে তোমার প্রতি তাদের অভক্তি জন্ম নিবে। তোমার উপস্থাপিত কথা এবং কাজ সে গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে না। *উসূলে ইফতা* কিতাবে আছে,

فان تاثير المظهر في عامة الناس لا ينكر.

অর্থ : বাহ্যিক অবস্থার প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া অনস্বীকার্য।

কেউ সাধারণ মানুষের মধ্যে ঠাটবাট দেখানোর জন্য জরিদার টুপি পরে, পাঞ্জাবীতে অ্যাম্ব্রয়ডারী করে। তো তাদেরও একটা উদ্দেশ্য আছে। তারা হয়তো কিছু লোকের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে চায়। আর যারা দীন চায়, তাকওয়া চায়, পরহেযগারী চায় আমরা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে চাই। যেন আমাদের কথা তাদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে। এজন্য পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরী। একজন মানুষকে দেখলে যদি মনে হয়, তিনি সতর্ক, তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তাহলে মানুষ তার উপস্থাপনা সাগ্রহে গ্রহণ করে।

পাকিস্তানের দারুল উলূম করাচীতে কোন নির্দিষ্ট ধরনের টুপি ব্যবহার বাধ্যতামূলক নয়। সেখানে একেকজন একেক ধরনের টুপি পরিধান করে। কেউ আজমীরী টুপি, কেউ জরিদার টুপি– যার যেমন খুশি পরিধান করে। পাকিস্তানে এক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে। স্বাধীনতার সুবাদে কিছু ছাত্র কালো রঙের টুপি পরিধান করত। আমাদের সেখানকার নেগরান মুফতী আব্দুল্লাহ সাহেব কাউকে কালো টুপি, কালো জামা পরা দেখলেই খুব রেগে যেতেন, কালো টুপির খারাবী বর্ণনা করতেন। বলতেন, কালো টুপির খারাবী হল, একে তো এটা বোঝাই যায় না যে, মাথায় আদৌ টুপি আছে কি না। অর্থাৎ দেখলে মনে হবে, হুযূর সাহেব টুপিই মাথায় দেয়নি। দ্বিতীয়ত এটা ময়লা হলে বোঝা যায় না। ময়লা হতে হতে দুর্গন্ধ ছড়ানোর আগ পর্যন্ত বোঝা-ই যায় না যে, এটা ময়লা হয়েছে। কেউ ধারণা করতে পারে, এটা তো ছাত্রদের জন্য ভালো। ময়লা পরিষ্কার করার জন্য বারবার সময় ব্যয় করতে হবে না! না, এটা ভালো নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা কাপড় কেন পছন্দ করতেন? তিনি সাদা কাপড় এজন্য পছন্দ করতেন যে, সাদা কাপড়ে ময়লা লাগলে সাথে সাথে দৃষ্টিগোচর হবে। ফলে যথাদ্রুত তা পরিষ্কার করাও সম্ভব হবে।

কাপড়-চোপড়ের পরিচ্ছন্নতা তোমার অন্তরে একটা পরিচ্ছন্ন ভাব নিয়ে আসবে। কাপড়-চোপড় যদি এমন হয় যে, ময়লার কারণে দুর্গন্ধ এবং মোটা না হয়ে গেলে তা ময়লা হয়েছে কিনা বোঝা যাবে না তাহলে এটা তোমার মস্তিষ্কে বালাদাত বা স্থূলতা সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ তোমার কাছে এ ময়লা আবর্জনা কোন বিষয়ই মনে হবে না। তোমার রুচি-প্রকৃতির মধ্যে কোমলতা বা সূক্ষ্মতা থাকবে না; স্থূলতা প্রাধান্য লাভ করবে। আর রুচি-প্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্মতা না থাকলে তোমার মস্তিষ্কে উম্মতের ব্যাধি প্রতিভাত হবে না। মানুষ যতই উল্টো-পাল্টা করুক তোমার কাছে কিছুই মনে হবে না। আমাদের এ শেষ যামানায় উম্মতের উল্টো-পাল্টা সবচে' বেশি কে ধরতেন? হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ.। উম্মতের উল্টো-পাল্টাগুলো তাঁর কাছেই বেশি ধরা পড়তো। আর তাঁর তবিয়তের সূক্ষ্মতা কেমন ছিল সে বিষয়ে তোমরা কিতাবে পড়েছ যে, কারো উন্মুক্ত পেট দেখলে তাঁর বমি হয়ে যেত। তাঁর রুচি-প্রকৃতির মধ্যে নাযাকাত এবং লাতাফাত ছিল বিধায় উম্মতের যত উল্টোপাল্টা, অনিয়ম তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল।

মোটকথা, তোমার বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার উপর প্রভাব ফেলবে। আর বাহ্যিক অপরিচ্ছন্নতা, আবিলতা অন্তরকে মলিন করে দিবে, অন্তর থেকে নাযাকাত দূর করে দিবে। তখন তুমি উম্মতের উল্টো-পাল্টা বুঝতে ও ধরতে পারবে না। এজন্য তোমাকে সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। ভাবুক সেজে পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন থাকা তালেবে ইলমের জন্য মোটেই কাম্য নয়। মোটকথা তোমার মেযাজ যেন এতটা সুস্থ থাকে যাতে উম্মতের অসুস্থতা তোমার সামনে ধরা পড়ে।

৫. নিগরান উস্তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে মাদরাসা চত্বরের বাহিরে যাইব না। সর্বদা মসজিদে তাকবীরে উলার সহিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিতে সচেষ্ট থাকিব।

ইহতিমাম তথা গুরুত্ব একটা স্বভাবগত বিষয়। কারো মাথায় যদি কোন জিনিসের গুরুত্ব চলে আসে তখন সে সেটার ইহতিমাম করে; গুরুত্ব বুঝে না আসলে করে না। এমন অনেকেই আছেন, কখনও কোন অবস্থায়ই তাদের নামাযের জামাআত ছুটে না। আবার কোন কোন উলামায়ে কেরাম এমনও আছেন যাদের জামাআতের সাথে নামায আদায় করা খুব মুশকিল হয়। মানুষের সামনে থাকলে হয়, নতুবা হয় না।

আমাদের ইফতা বিভাগে একটা প্রশ্ন এসেছে– এক বিরাট খতীব সাহেব। যার মাসিক বেতন ৭৫,৫০০/- টাকা। টিভিতেও প্রোগ্রাম করেন। তো ঘটনা হল– খতীব সাহেব মসজিদেরই চতুর্থ তলায় কোয়ার্টারে থাকেন। চারটি জুমুআ ব্যতীত অন্যান্য ওয়াক্তিয়া নামাযে তাকে মসজিদে দেখা যায় না। এমনকি ফজরের সময় তিনি চতুর্থ তলায় ঘুমান ঠিক, কিন্তু নিচে এসে নামাযে শরীক হন না। মুসল্লীরা প্রথম প্রথম মনে করেছে, সাময়িক ওযর-আপত্তি থাকতে পারে, এ জন্য হয়তো আসে না। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল, এটা খতীব সাহেবের অভ্যাস। অতঃপর এটা নিয়ে মুসল্লীদের মধ্যে কানাঘুষা লক্ষ্য করে তিনি মুসল্লীদের নিকট থেকে কিছু ঋণ নিয়ে উত্তরায় একটা ফ্ল্যাট কিনে এখন সেখানেই থাকেন। এমন নয় যে, তিনি সেখানে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায পড়া শুরু করেছেন; বরং জামাআতের সাথে নামায আদায় না করায় যে আপত্তি উঠেছিল তা এড়ানোর জন্য তিনি সেখানে চলে গেছেন। এছাড়া আর্থিক কেলেঙ্কারী ইত্যাদি তো আছেই। 'আযহারী' খেতাবধারী এই খতীব সাহেবের আমাদের এদেশীয় উলামায়ে কেরাম বা মাযহাবপন্থী উলামায়ে কেরামের প্রতি কোনও শ্রদ্ধাবোধ নেই। যখন সে বিভিন্ন বিষয়ে বয়ান দেয় যে, নামের সাথে এরা মাওলানা কেন লাগায়, মৌলভী কেন লাগায়, মুফতী কেন লাগায় ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন সাধারণ মানুষ খুব খুশি হয়। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে তার আমলের দশা এই।

মোটকথা নামাযের পাবন্দি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর তাওফীক দান করুন। আমীন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

অনুলিখন : মাওলানা মাহমূদুল হাসান খুলনাবী,
শিক্ষক : মা'হাদুল বুহূসিল ইসলামিয়া, বছিলা, ঢাকা।

কিশোর প্রতিভা

আমি ধন্য

সকাল থেকেই মনটা ভালো নেই। মনমরা হয়ে বসে আছি। হঠাৎ পরিচিত ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টাটি বেজে উঠল, যেমন বেজে ওঠে প্রতিদিন। ঘণ্টাধ্বনি শেষ না হতেই উস্তাদজী দরসে চলে আসলেন। আমার পরম প্রিয় উস্তাদ। তার স্নেহের পরশ আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। তার সান্নিধ্যে নূরের স্নিগ্ধতা খুঁজে পাই। তিনি আমাদেরকে নবী-জীবনীর দরস দিবেন। *সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া*। দরস শুরু হল। তিনি বললেন, এ কিতাবটি তোমরা কখনোই শুধু সবক ভেবে পড়বে না। পড়বে মনের গহীনে থাকা জীবন্ত উপলব্ধি থেকে। ভাববে, হৃদয়ের আয়নায় ভেসে ওঠা কোন চরিত্র পড়ছি যেখানে আছে জীবনের পরম মাধুর্য। ... উহুদ যুদ্ধ ...।

ধীরে ধীরে দরস শেষ হয়ে এলো। উস্তাদজীর বাণীতুল্য কথাটি মনে অদ্ভুত এক ভালোলাগার সৃষ্টি করল। মনে হলো, আজ খুঁজে পেলাম পড়ালেখার এক অন্য দিগন্ত।

দিনের শেষে রাত হল। সামনে সীরাতের উহুদ অধ্যায়। পড়তে শুরু করলাম। উহুদ যুদ্ধ। এক রক্তাক্ত উপাখ্যান। আমার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শির মুবারকে লোহার আংটার প্রচণ্ড আঘাত। তীরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত অবয়ব। রক্তে ভেসে যাওয়া পবিত্র দেহ। প্রাণাধিক প্রিয় রাসূলের হিফাযতে সাহাবীগণের জানবাজী রাখা ভয়াবহ চিত্র। ...

আহ! কী নির্মম। জানি না তখন আমার প্রিয় নবীর মুবারক চেহারা কেমন হয়েছিল। রক্তাক্ত উহুদ কতোটা আহত হয়েছিল। ভাবনায় তন্ময় হয়ে গেলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই করুণ চিত্র। অজান্তেই দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। শব্দহীন নোনা অশ্রুগুলো বিন্দু বিন্দু রক্ত হয়ে ঝরে পড়লো। কিছুক্ষণ পর সম্বিত ফিরে পেলাম। তখনই ফের মনে পড়ল আমার উস্তাদজীর দরসে বলা সেই কথাগুলো। আর অনুচ্চস্বরে মুখ থেকে বেরিয়ে এলো 'আলহামদুলিল্লাহ' আমি ধন্য।

মুহাম্মাদ ইয়াসীন আরাফাত খান
জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ মাদরাসা

বৃষ্টিভেজা রদ্দুরে রক্তভেজা এপ্রিল

মেঘের চাদরে আবৃত গোটা আকাশ। মাঝে মাঝে ভুবন কাঁপিয়ে তোলা বিজলীর গর্জন। হয়তো তার সুমিষ্ট পানিতে ভাসিয়ে দিবে পৃথিবীটাকে। কিছুক্ষণ পরই শুরু হল প্রচণ্ড বাতাস আর প্রবল বর্ষণ। তবে বৃষ্টি হয়েই থেমে গেল আর পরক্ষণেই এক ঝলক আলোকরশ্মি ভুবনকে আলোকিত করে তুলল। গাছের পাতায় থাকা পানি আলোয় ঝলমল করে উঠল মুক্তার মত। দিনটি এপ্রিলের প্রথম প্রহর। যা হারিয়ে যাওয়া অতীতের ভয়ার্ত স্মৃতির স্মারক। মনে হতেই আমি চিন্তায় ডুবে গেলাম, চলে গেলাম অতীতে হারিয়ে যাওয়া স্পেনের সেই করুণ দৃশ্যে। যখন এপ্রিলের প্রথম সূর্য উদিত হয়েছে অসংখ্য মুমিনের বিভৎস লাশের উৎকট গন্ধ নিয়ে, নিষ্পাপ শিশুর সকরুণ কান্না নিয়ে।

তারেক বিন যিয়াদের বিজিত স্পেন। দীর্ঘ আটশত বছর মুসলমানদের গৌরবময় শাসন। ধীরে ধীরে বিপর্যয়। বিলাসিতা ও অসতর্কতার সুযোগে খ্রিস্টান বাহিনী স্পেনের রাজধানী গ্রানাডায় আক্রমণ করে বসে। মুসলমানরা এই অতর্কিত হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর রাজা ফার্ডিন্যান্ড মুসলমানদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়। সে তার সৈন্য বাহিনীকে মসজিদের আশপাশে লুকিয়ে থাকার পরামর্শ দেয় এবং মুসলমানদের মাঝে ঘোষণা দেয় যে, যদি তোমরা নিরস্ত্র হয়ে গ্রানাডার মসজিদগুলোয় আশ্রয় নাও তাহলে তোমাদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে। অন্যথায় আমাদের হাতে তোমাদের প্রাণ দিতে হবে। এ কথা শুনে অসহায় মুসলমানরা সেসব পিশাচের ধূর্ততা না বুঝে যুদ্ধ ছেড়ে মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখনই বিশ্বাসঘাতক জালিমের নির্দেশে মসজিদগুলোর চতুর্দিকে আগুন লাগিয়ে সমূলে পুড়িয়ে মারা হয়। সেই দিন আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়েছিল মুসলমানদের আর্তচিৎকারে। পৃথিবী দেখেছিল এক নির্মম দৃশ্য। সে কি নির্মম, নির্মমতা। যা বর্ণনা করা যায় না। বড় অবাক হই, স্তম্ভিত হই, যখন আজও দেখি প্রতিনিয়ত সেই নিষ্ঠুর এপ্রিলের পুনরাবৃত্তি। শুনি ইথারে হারিয়ে যাওয়া মুমিনের ফরিয়াদ। চারিদিকেই শুধু নিপীড়ন, নির্যাতন। ঐ তো দেখো, মার খাওয়া ফিলিস্তিন, জ্বলন্ত ইরাক, রক্তাক্ত আফগান আর নিথর কাশ্মীর। কিন্তু কেন এমন হয়? আমরা কেন এমন?

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ফারহান
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

সেই একটি কথা

কিছুদিন থেকেই ভাবছি জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়ায় যাবো। হৃদয়ের একান্ত তামান্নাটা পুরা করবো। ভাবনা ভাবনাই থেকে গেল। যাওয়া আর হলো না। সেদিন শুক্রবার। সকাল পেরিয়ে দুপুর ছুঁইছুঁই। হাযির হলাম জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়ায়। যেখানে কিছুদিন আগেও ছিল জনমানবশূন্য প্রান্তর। ছিল ঝিলের ধারে ঢেউ তোলা সফেদ কাশফুল। তবে আজ চোখের সামনে আলোকিত এক প্রান্তর। ইলমী পদচারণায় মুখরিত এক গর্বিত কানন। যেখানে নূরের ফোয়ারা বিচ্ছুরিত হয়। আমি আপ্লুত হলাম। তবে আজ কেবল জামি'আর প্রাসাদ, প্রান্তর আর আপন কিছু বন্ধুর সাক্ষাত পেয়েই ধন্য হলাম। দূর থেকেই শুধু ইলমী সৌরভে মোতিহ হলাম।

তিন বছর আগে। আমি তখন গাজীপুরে পল্লী গাঁয়ের ছোট্ট তালিবে ইলম। মাওলানা মাহমূদুল হাসান দা.বা. এর নিবিড় তত্ত্বাবধানে পড়ালেখা করেছি। আজ অনেক দিন হুযূরের দরস ও সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত। বারবার পূর্বের সেই দিনগুলো মনে পড়ছে। স্মৃতির আয়নায় হুযূরের দরসের চিত্রগুলো ভেসে উঠছে।

হুযূরের সাথে যোগাযোগ করলাম। হুযূর বললেন, আমিতো রাহমানিয়ার অদূরেই মা'হাদে আছি, এখানে চলে এসো। মহা নিয়ামত ভেবে বন্ধু তাওহীদকে সাথে নিয়ে চলে গেলাম মা'হাদ ভবনে। সাক্ষাত হল হুযূরের সাথে। হুযূর আমাদেরকে আপ্যায়ন করলেন। হৃদয়টা ভরে গেল। তারপর পরিচয় হল নতুন এক পত্রিকা 'দ্বি-মাসিক রাবেতা'র সাথে। হুযূর আমাদের দু'জনের হাতে দু'টি কপি দিয়ে বললেন, এ পত্রিকাটি রাহমানিয়ার তত্ত্বাবধানে দু'মাস পরপর প্রকাশ হয়। শুনে আনন্দিত হলাম।

হুযূর আমাকে বললেন, আব্দুল মালিক! সুযোগ যেহেতু আছে, তুমিও কিছু কিছু লেখালেখি শুরু কর। আমি বললাম, হুযূর! জীবনে তো কোনদিন লেখালেখি করিনি, লিখব কিভাবে তাও জানি না। হুযূর বললেন, এখনো যদি না লিখ সারা জীবন বলতে হবে 'জীবনে তো কোনদিন লেখালেখি করিনি'। আমি কথাটাকে বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে ভাবলাম, হুযূর তো ঠিকই বলেছেন। মূল্যবান কোন একটি কথার দ্বারাই মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসতে পারে। এই সেই একটি কথা যা আমি হৃদয়ের গভীর থেকে অনুভব করি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, অবশ্যই আমাকে লিখতে হবে।

উস্তাদের দু'আয় 'রাবেতা'র সফলতা ও সুন্দর ভবিষ্যতের বুকভরা আশা নিয়ে কলমের যুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম। হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন। আমীন।

আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ
জামিয়া হুসাইনিয়া আরাবিয়া, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

রোজনামচার পাতা থেকে

আজ বৃহস্পতিবার। এপ্রিলের ১৬ তারিখ। মেয়র নির্বাচনের আর মাত্র ১২দিন বাকী। নির্বাচনী ঝড়ে কাঁপছে গোটা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। মিছিলে মিছিলে মুখরিত নির্বাচনী এলাকা। হ্যান্ডবিল-পোস্টারে ছেয়ে গেছে রাস্তাঘাট। যেন পোস্টারের শামিয়ানা টানিয়ে দেয়া। যেদিকেই কান পাতি শুধু একই আওয়াজ– ভোট চাই ভোটারের, দু'আ চাই সকলের, ২৮ তারিখ সারাদিন, ... মার্কায় ভোট দিন। আরো কত কি!

মোটকথা, সর্বত্র এক অন্যরকম অবস্থা বিরাজ করছে। নির্বাচন যুদ্ধে যারা অবতীর্ণ হবেন ইতোমধ্যে কোমর বেঁধে তারা মাঠে নেমেছেন। আরাম-ঘুমের ফুরসত নেই তাদের। প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসীদের হামলা-মামলার কোন তোয়াক্কা নেই। রাত-দিন একই কাজ, একই চিন্তা, যে করেই হোক ব্যালট যুদ্ধে আমাকে জয়ী হতেই হবে। এজন্য যেকোন ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে পরদিন সকাল পেরিয়ে পুরোটা সময়ই তারা নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত। অর্থ, সময় ও সামর্থ্যের শেষটুকু বিসর্জন দিতেও তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যদিও নিশ্চয়তা নেই শেষ ফলাফল কী দাঁড়াবে। কে হাসবে, কে কাঁদবে। কে জিতবে, কে হারবে। তবে আর যাই হোক অর্থ ও সময়ের 'শ্রাদ্ধ' করে কেউ হয়তো বিজয়ের হাসি হাসবে আর বাকীরা অন্তত জনসমাজে পরিচিত হতে পারবে।

এসব থেকে আমি লাভ করেছি আমার জীবনের এক পরম শিক্ষা। পরম লক্ষ্যের পানে চরম সাধনার শিক্ষা। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল জেলখানার ডাকাতদল থেকে পেয়েছিলেন যেমন ধৈর্য ও অবিচলতার শিক্ষা। তুচ্ছ দুনিয়ার সামান্য তৃপ্তির জন্য যদি এত কঠোর সাধনা করতে হয়, অথচ এখানে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নেই; নেই তৃপ্তির স্থায়িত্ব। তবু কী উদ্যম-উদ্দীপনা, কী নিষ্ঠা ও একাগ্রতা। তাহলে ইলমের অনুশীলনের জন্য কেমন হতে হবে আমার অনুশীলন ও সাধনা। আমি তো চাই আমার জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে গোটা মুসলিম সমাজ। আমি তো চাই জ্ঞানের অগ্নিবর্ষণে বাতিলের কারসাজি ভস্ম করে দিতে। আমার বয়ান-বক্তৃতা ও কলম চালনায় যেন ত্রাস সৃষ্টি হয় ইসলামের শত্রু শিবিরে। আমার ইলম যেন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে উপকৃত করে যুগ যুগ ধরে।

এই যদি হয় আমার হৃদয়ের বাসনা ও মনের আকাঙ্ক্ষা তাহলে কেন আমি ইলমের তলবে ও জ্ঞানের সাধনায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করছি না! ওরা যা করতে পারে তুচ্ছ দুনিয়ার জন্য, আমি কেন তা করতে পারি না মহামূল্যবান ইলমের জন্য! ইলমের সাধনায় অবশ্যই আমাকে ওদের ছাড়িয়ে যেতে হবে। আমার সাধনাই হবে সেরা সাধনা। আমি নিজেই হবো আমার তুলনা। হে আল্লাহ! তুমি আমার সহায় হও। আমার তামান্নাগুলো কবুল করো। পূর্বসূরীগণের পদাঙ্কানুসারে এগিয়ে চলার তাওফীক দান করো। আমীন।

তানভীর মুস্তফা
কাপাসিয়া, গাজীপুর

আল্লাহর নির্ধারিত বণ্টনই উপযুক্ত

আল্লাহ তা'আলা নিজ মহিমায় এ ধরণী সৃষ্টি করেছেন। পাহাড়, সাগর, বৃক্ষ, নহর প্রভৃতি দ্বারা ধরণীকে সাজিয়েছেন। প্রতিটি জীবের জন্য নির্ধারণ করেছেন উপযুক্ত পরিবেশ, বসবাসের স্থান। যেমন, মাছের বসবাসের স্থান পানি। পানি ছাড়া সামান্য সময় তার জীবনাবসানের কারণ হয়। তেমনিভাবে সৃষ্টির সেরা মানুষের জন্যও উপযুক্ত পরিবেশ, বসবাসের স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন নারী, ঘরে থেকে সন্তানাদি পালন, স্বামীর সম্পদ হিফাযত এবং ঘরের সকল কাজ আঞ্জাম দিবে। আর পুরুষ, পরিবারের সকলের খাদ্যের যোগান দিবে। ঘরের বাইরের সকল কাজ আঞ্জাম দিবে। ইবাদত-বন্দেগীর জন্য মসজিদে যাবে। এই নির্ধারণী পরিবেশের ব্যতিক্রম হলে সমাজে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে।

একদিন এরূপ এক অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সম্মুখীন হলাম। দুপুরে খানা খাওয়ার পর মাদরাসার কাজে বাইরে বের হলাম। পথে হাঁটছি; হঠাৎ একটি বিক্ষোভ মিছিল দেখতে পেলাম। সামনের সারিতে বেশ কিছু মধ্যবয়সী নারী গলা ফাটিয়ে হাত উঠিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। দেখে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলাম। আফসোস! আমাদের নারী সমাজের প্রতি, একি অবস্থা! আরো কিছুদূর যাওয়ার পর এর চেয়েও বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হলাম। দূর থেকে দৃষ্টি পড়ল একটি অফিসের উপর। দেখলাম, দরজায় কেয়ারটেকার, ডিউটি পালন করছে হয়তো। মনে হল একজন সুশ্রী যুবক। দাঁড়িয়ে মোবাইলে কথা বলছে। গায়ে শার্ট-কোর্ট এবং পরনে প্যান্ট। চুলগুলো ছোট ছোট। কিন্তু কাছে গিয়ে শংসয়ে পড়ে গেলাম! এতো যুবতী; যুবক নয়। একি দশা সমাজের! পোশাক পরিচ্ছদের এ কেমন দুর্গতি!

নিজের বেশ বাদ দিয়ে অন্যের বেশ ধারণ করায় কী এমন তৃপ্তি লাভ হয়। এমন নারীর প্রতিই তো অভিসম্পাত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ ঐ সকল নারীর উপর অভিসম্পাত করেন যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে।

জানি না আমাদের কতোজন নারী এ অভিসম্পাত থেকে রক্ষা পাবেন। সমাজের যে বেহাল অবস্থা, গুনাহের যে সয়লাব, ধর্মীয় চেতনার যে অভাব রাব্বুল আলামীন কুদরতী হাতে রক্ষা না করলে কোনভাবেই এসব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ আমাদের মা-বোনদের পবিত্রতা রক্ষার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আব্বাস
জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ মাদরাসা

দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলো

কালের প্রাচীর পেরিয়ে, শতাব্দির সীমানা ছাড়িয়ে হাজার বছর পেছনে ফিরেও দেখা যায় যেখানেই ইনকিলাব, দুর্বার বিপ্লব, সেখানেই ছিল বাধা, ছিল প্রতিরোধ ও আচ্ছন্ন কুয়াশা।

ঘোলাটে পরিবেশ। ভয়াবহ পরিস্থিতি, প্রতিকূল অবস্থা। শুধু একালেরই বৈশিষ্ট্য না; সেকালেরও বৈশিষ্ট্য। তবুও সেকাল স্বগর্ভে ধারণ করেছে ইবনে আব্বাস রাযি. এর মত সুমহান প্রতিভাকে, মাথার তাজ বানিয়েছে আবু হানীফা ও মালেকের মত মোহনীয় দৌলতকে।

তাই আজো নতুন ইনকিলাব আর বিপ্লবের পবিত্র বসন্তে বরণীয় হতে হলে ধেয়ে আসা পাহাড়সম বিপদ ঢেউ, ঘনিয়ে আসা জলোচ্ছ্বাস আর সাইক্লোনের মতো মহাদুর্যোগেরও অপ্রতিরোধ্য মোকাবেলা করতে হবে। তারা তো তার চেয়েও ভয়ঙ্কর অগ্নি প্রাচীরের সীমানা মাড়িয়ে বর্ষ্যমান তুষারের মহা আস্তরণ পাড়ি দিয়ে বিজয়ের মহাচিত্র এঁকেছেন। এক নতুন পৃথিবীর গোড়াপত্তন করেছেন। ইতিহাসের ভাষাও তাই বলে–

হিজরতের তিন বছর পূর্বে যখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের জন্ম। রাসূলের ইন্তিকালের সময় যিনি মাত্র তের বছরে পদার্পন করেছেন। যখন আকাবির সাহাবাগণের স্বর্ণালী সময়। কে চেনে আব্দুল্লাহকে, কি হবে এতোটুকুন আব্দুল্লাহকে দিয়ে। না, এ আব্দুল্লাহই এক লক্ষ-কোটি নক্ষত্রের মাঝেও জ্বালাতে চেয়েছিলেন সূর্যের মত প্রতিভা। তাই আজও আমরা দেখতে পাই তাফসীরে ইবনে আব্বাসের মত মহাদৌলত। আমাদের সামনে স্বর্ণযুগের শ্রেষ্ঠতম শ্রেষ্ঠ মানুষ প্রতিকূলতার বাঁধা ডিঙ্গিয়ে গাঢ় কুয়াশার আস্তরণ চিরে বেরিয়ে আসা ইতিহাসে জ্বলজ্বল করা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.।

এরূপই সে যুগের অখ্যাত ক্ষুদ্র এক সরল ছেলে নু'মান যদি জনৈক ইমামের সামান্য কথায় প্রভাবিত হয়ে হাম্মাদের দরসে না বসতেন, চলে যেত তার জীবন ক্ষুদ্র ব্যবসার মার-প্যাঁচেই; হয়েও যেতেন তিনি তাবেয়ী। আবার কাটাতে পারতেন তিনি জনবসতি ত্যাগ করে গহীন অরণ্যে গভীর তপস্যায়। কিন্তু ফিকহের মত সুবিশাল কোন 'ফন' (শাস্ত্র) উম্মাহ আজ তাঁর মাধ্যমে পেত না। কাজীর পদ সামনে এসেছে। গ্রহণ না করার শাস্তিতে কারাগারের প্রকোষ্ঠে। সর্বশেষ বিষ প্রয়োগের ফলে প্রাণত্যাগ করেছেন। এভাবে আমরণ প্রতিকূলতা এসেছে। পদের ঠমক আর শাহী ধমক, কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ, আর সর্বশেষ প্রাণনাশক মহাশাস্তি, এসেছে বরাবর সব পরীক্ষাই। কিন্তু শত প্রতিকূলতা আর বাঁধা বিপত্তির পাহাড়সম ঝড়-তুফান আর ঘূর্ণিপাকের মাঝেও তিনি তার কথা হতে একবিন্দু টলবার ছিলেন না। কি এমন কারণ ছিল, এতসব কিছু যার সামনে ছিল অতি তুচ্ছ। আর কিছু নয়; শুধু যাতে ওদের কথামত ফতওয়া দিতে না হয়, যাতে কুরআন-সুন্নাহকে তাদের মর্যাদাবান স্বস্থানে ও যথাস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখা যায়, যাতে لا تتبع أهوائهم এর উপর আমল হয়ে যায়।

এমন কি শুধু একজন? ইনকিলাব যিনিই এনেছেন, আলোড়ন যেখানেই সৃষ্ঠি করেছেন সেখানেই ছিল যুলুম অন্ধকারের পৈশাচিক চরম সংকট আর হাড্ডিসার প্রকোষ্ঠের করাল গ্রাসের বিনাশী ত্রাস।

শৈশবে ইয়াতীম বালক শাফেয়ীর কাগজ কেনার টাকা পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু এ নাজুক অবস্থায় বিভিন্ন জায়গা থেকে হাড্ডি কুড়িয়ে এনে তাতে হাদীস লিখে সংগ্রহ করে একসময় তিনি ইমাম হয়েছেন।

ইমাম বুখারীর পোশাকের অভাবে দরসে বসার সুযোগটুকুও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। তথাপি দৃঢ়তা ও হিম্মতের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইতিহাসে রেখে তিনি আজ সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস গ্রন্থ সহীহ বুখারীর লেখক।

তাই একটু ভেবে দেখা উচিত। তাদের ইনকিলাব আর আমাদের ইনকিলাব, তাদের চেষ্টা আর আমাদের প্রচেষ্টা, তাদের দৃঢ়তা আর আমাদের অবিচলতা। একটু ভেবে দেখ হৃদয়ের গহীন থেকে অনুভব কর আর নতুন সংকল্পে নবচেতনায় জেগে ওঠো। অপ্রতিরোধ্য দুর্বার গতিতে সম্মুখে এগিয়ে চলো। বজ্র কণ্ঠে ধ্বনি তোলো–

উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাবো তিমির রাত
বাঁধার বৃন্ধাচল।

মুহাম্মাদ বুরহান সিদ্দীক যশোরী
জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ মাদরাসা

শোকর গোযারী

(আল্লাহ তা'আলার অশেষ শোকর, রাবেতার কিশোরপ্রতিভা বিভাগে লেখকদের কাছ থেকে আমরা প্রচুর সাড়া পাচ্ছি। রাবেতাকে আপন ভেবে যারা লেখা পাঠানোর কষ্টটি স্বীকার করছেন তাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ। কিশোর প্রতিভা পাতাটি আসলে কোন নির্দিষ্ট বয়সের ইঙ্গিত প্রদান করে না। কিছু নবীন লেখক– লেখালেখির ক্ষেত্রে এখনো যাদের কোন মুরুব্বীর শিষ্যত্ব গ্রহণের সুযোগ হয়নি– সীমিত সাধ্য অনুযায়ী তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। এভাবে যদি কিছু সংখ্যক নবীনও এ ময়দানের সিপাহসালার হওয়ার স্বপ্ন দেখেন এবং অতঃপর কোন বটবৃক্ষের নিরাপদ ছায়ায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত হোন এটাকেই আমরা পরম সাফল্য জ্ঞান করবো। - বিভাগীয় সম্পাদক)

(২ পৃষ্ঠার পর, সম্পাদকীয়)

শরীয়ত মতে অবৈধ। বেগানা নারী-পুরুষের বেপর্দা দেখা-সাক্ষাত কেন মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর। মেয়েদের জন্য দুনিয়াবী উচ্চশিক্ষা কেন উচিত নয়। মায়েদের শারীরিক সমস্যা না থাকলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ কেন নির্বুদ্ধিতার কাজ। ভরণ পোষণের ব্যবস্থা থাকলে মেয়েদের চাকুরি করা কেন তার নিজের জন্য অভিশাপ। সূদী ব্যাংকে চাকুরী করা কেন চুরি করার চেয়েও মারাত্মক গুনাহের কাজ। কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবী কেন করতে হয়। নাস্তিক-মুরতাদদের শাস্তির দাবিতে কেন সোচ্চার হতে হয়। সেবার মুখোশ পরে আসা খ্রিস্টান-এনজিওদের কেন শত্রু ভাবতে হয়। আমলদার আলেমদেরকে কেন অভিভাবক হিসেবে মানতে হয়। জাগতিক শিক্ষা কেন জাতির মেরুদণ্ড নয়; বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে তা জ্ঞানই নয়। কুরআন-হাদীস অধ্যয়নরত নিরীহ ছেলেরা কেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া কেন সহীহ দীন প্রচারের মাধ্যম হওয়ার যোগ্য নয়। এ জাতীয় আরো অনেক 'কেন' আছে যার জবাব বিবেকের কাছে ইতিবাচক নয়।

এসব 'কেন'র জবাব সহজ ও ইতিবাচক হয়ে যাবে যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হুকুম শরীয়তের গোলাম হই। আসুন হজ্জ ও কুরবানীর বিধান থেকে আমরা প্রভুর হুকুমের নিঃশর্ত গোলামীর শিক্ষা নিই। তাহলেই আমাদের গোলামী পূর্ণতা পাবে এবং গোলাম হিসেবে আমাদের মর্যাদা বাড়বে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় গোলামীর বিনিময়ে চিরস্থায়ী পরকালে আমরা মহান মালিকের বন্ধুত্বের অধিকারী হবো। তখন তিনি হবেন আমাদের প্রেমিক আর আমরা হবো তাঁর প্রেমাস্পদ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সহীহ সমঝ দান করুন। আমীন।